দাম : সাত টাকা
৬৪ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা ।।
১৩ ফেব্রুয়ারি - ২০১২
২৯ মাঘ - ১৪১৮

স্বস্তিকা

বাল কলা সঙ্গম

উত্তর-পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নতুন আলোর দিশারী

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ❑ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ❑ ৬-৭

মাস্টারমশাই কেশবচন্দ্র চক্রবর্তীর জন্মশতবর্ষের প্রস্তুতি রাজ্য জুড়ে ❑ ৮

রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা ঢাকতে কেন্দ্রকে দোষী সাব্যস্ত করার কমিউনিস্ট উত্তরাধিকার কি এবার মমতা হাতে? ❑ ৯

ভারতের গণতন্ত্র কি সত্যিই গণতন্ত্র? ❑ ১১

পাকিস্তানকে ভারতের ডিজেল ও বিদ্যুৎ : মুমূর্ষুকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে ❑ মুজফফর হোসেন ❑ ১৩

উত্তর-পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নতুন আলোর দিশারী: সংস্কার ভারতী ভিশন- ২০২০ আয়োজিত 'বাল কলা সঙ্গম' ❑ হরিমোহন দাস ❑ ১৫

সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের আলোকে উদ্ভাসিত সংস্কার ভারতীর 'ভিশন ২০২০' ❑ অর্ণব নাগ ❑ ১৬

ভবিষ্যৎ নির্বাচন ও শ্যামাপ্রসাদের অতীত সাবধানবানী ❑ শিবাজী গুপ্ত ❑ ১৮

খোলা চিঠি : চাষি ভাইরা, আত্মহত্যা করে দিদিকে চাপে রাখবেন না প্লিজ ❑ সুন্দর মৌলিক ❑ ২১

শিবরাত্রি উৎসব ❑ নবকুমার ভট্টাচার্য ❑ ২৪

ঐতিহাসিক দুর্গ পুরন্দর ❑ সোমশুভ্র চক্রবর্তী ❑ ২৫

ভারতের জমি-ব্যবস্থার সেকাল-একাল ❑ গোপীনাথ দে ❑ ২৭

বিদেশে আরও একটা লজ্জাকর ক্রিকেট সিরিজ ❑ জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ❑ ২৯

নিয়মিত বিভাগ

এইসময় : ১০ ❑ চিঠিপত্র : ২২ ❑ ভাবনা-চিন্তা : ২৩ ❑ শব্দরূপ : ৩০ ❑ চিত্রকথা : ৩১ ❑ সমাবেশ-সমাচার : ৩২ ❑

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ২৪ সংখ্যা, ২৯ মাঘ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ১৩ ফেব্রুয়ারি - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

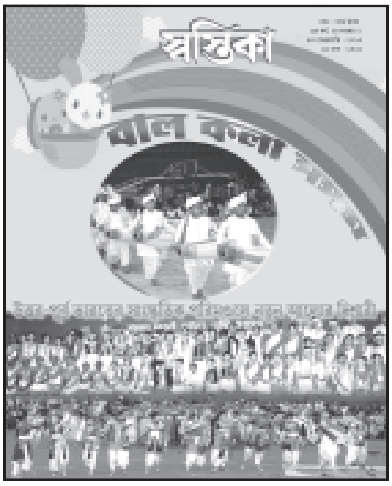

'বাল কলা সঙ্গম' — পৃঃ ১৫-১৬

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail :
swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

শৃঙ্খলিত কেন্দ্রের ইউপিএ সরকার

এই দেশের সমাজ যখন স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী বা 'জনগণমন অধিনায়ক' গীতটির শতবর্ষ পালনে ব্যস্ত, এই প্রসঙ্গে তখন মনে করিয়ে দেওয়া যাইতে পারে, সাম্প্রতিক কয়েকটি দিন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় টেলিকম মন্ত্রী রাজার নামের সহিত চিহ্নিত হইয়া থাকিবে। ২-জি কেলেঙ্কারিতে প্রধান অভিযুক্ত হিসাবে তিনি পুরো বছরটাই কারান্তরালে রহিয়াছেন। নিজেদের মন্ত্রীর এই কেলেঙ্কারির কারণেই ইউপিএ সরকার পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই কেলেঙ্কারির পর হইতে সরকার একটির পর একটি নানা অযৌক্তিক কাজ করিয়া চলিয়াছে। যদি এই কথা ভাবাও যায় যে আদালতের সাম্প্রতিক দুইটি রায়ে, বিশেষত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরম সম্পর্কে নিম্ন আদালতের রায়ে, সরকার স্বস্তি বোধ করিতে পারে, তবে তাহা যে মোহ মাত্র, সেই সতর্কবার্তা উচ্চারণ করিতে কোনও দ্বিধা নাই। কেননা অনেকবারই দেখা গিয়াছে, উচ্চ আদালতে নিম্ন আদালতের রায় খারিজ হইয়া গিয়াছে।

২-জি সংক্রান্ত আদালতের রায় পুরোপুরি বুঝিয়া উঠিবার আগেই এবং সুপ্রীম কোর্টে এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানানো হইতে পারে—ইহা জানা সত্ত্বেও সেনাপ্রধানের জন্ম তারিখের বিষয়টি লইয়া ইউপিএ সরকার সংঘাতে জড়াইয়া পড়িয়াছে। ইসরো ডেভাস (ISRO-DEVAS) দুর্নীতি লইয়া ইসরো-প্রধান আর মাধবন নায়ার এবং অন্য তিনজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর বিরুদ্ধে যেভাবে সরকার চরম খামখেয়ালিপনার পরিচয় দিয়াছে, তাঁহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলিয়াছে, তাহা এখন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়িয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চান্দ্রায়ণ অভিযানে শ্রী নায়ারের ভূমিকা অবিসংবাদিত এবং এই সরকারই ২০০৯ খৃস্টাব্দে তাঁহাকে পদ্মবিভূষণ উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিল। অথচ সরকার মনে করিতেছে সেনাপ্রধান ও এই বিশিষ্ট মহাকাশ বিজ্ঞানীর সহিত সংঘাত যেন এমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। কেননা একই সঙ্গে সরকার মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার এস ওয়াই কুরেশির সহিতও বিতর্কে জড়াইয়া পড়িয়াছে।

ইতিমধ্যে আরও একটি সাংবিধানিক সংস্থা 'ক্যাগ'-এর সহিত সরকারের সংঘাত সৃষ্টি হইয়াছে। ইউ আই ডি লইয়া সরকারের তিনটি দপ্তরের মধ্যে বাগবিতণ্ডা এবং টিভি-র পর্দায় সেই বিতর্ক লোকে দেখিতেছে।

এভাবেই কি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব চলিতেই থাকিবে? সরকার কি এইরকম এক অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিবে? ইহা কি কোনও সরকারের পক্ষে স্বস্তির লক্ষণ? সুষ্ঠু ভাবে শাসনকার্য পরিচালনার পরিচয়? নিম্ন আদালতের রায়ে চিদাম্বরমকে লইয়া সরকার সাময়িক স্বস্তি হয়তো পাইয়াছে। কিন্তু জন্ম তারিখের বিষয়টি লইয়া আদালতের রায় যদি সেনাপ্রধানের পক্ষে যায়, তাহা হইলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এ কে অ্যান্টনির পদত্যাগের দাবীটি যে জোরালো ভাবে উঠিবে, তাহা কি অস্বীকার করা যায়?

ইউপিএ-২ সরকার যে এত বিভিন্ন কেলেঙ্কারি ও বিতর্কে জড়াইয়া পড়িতেছে তাহার কারণ নির্ণয়ে পণ্ডিত বা রায়সিনা হিলের ঘনিষ্ঠ হওয়ার প্রয়োজন নাই। ইহার পশ্চাতে তিনটি কারণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমত, এই সরকার দুর্বল, অতি দুর্বল এবং দুর্বল নেতৃত্বের একটি দল যেমন হয় ঠিক তেমন। টেলিকম বন্টনের নীতি থেকে ইসরো-ডেভাস লইয়া জটিলতা— সর্বত্রই দৃঢ় প্রত্যয়ের অভাব ও সত্যকে আড়াল করিবার প্রবণতা। দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক নিপুণতার অভাব। সেনাপ্রধানের জন্মতারিখের বিষয়টি দৃঢ়, দক্ষ ও একটু উদারতার সহিত পরিচালিত হইলে সেনাপ্রধানের মর্যাদা ও সরকারের কর্তৃত্ব—দুইই রক্ষিত হইত। তৃতীয় কারণটি প্রথম দুইটির মতোই গুরুত্বপূর্ণ এবং ওই দুই কারণের একরকম ফলশ্রুতি—মন্ত্রিসভার শীর্ষস্থ তিন চারজনের মধ্যে পারস্পরিক বৈরিতা-আকচাআকচি, অথচ তাঁহারা সকলে একই দলের— কংগ্রেসের সদস্য। এই যখন অবস্থা তখন এই সরকারের নিকট হইতে ইহার চেয়ে ভালো আর কি আশা করা যাইতে পারে? ইউ পি এ-২ সরকার এক শৃঙ্খলিত কেন্দ্রীয় সরকার।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

যদি এই পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ থাকে, যাকে 'পুণ্যভূমি' নামে বিশেষিত করা যেতে পারে, যদি এমন কোনও স্থান থাকে,...যেখানে মানুষের ভেতর ক্ষমা, দয়া, পবিত্রতা, শান্তভাব প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ সবচেয়ে অধিক পরিমাণে হয়েছে, যদি এমন কোনও দেশ থাকে, যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হয়েছে, তবে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি সে আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতবর্ষ।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

প্রচ্ছদ নিবন্ধ : সংখ্যালঘু তোষণের আর এক রূপ

উত্তরপ্রদেশে সাম্প্রতিকতম বিধানসভা নির্বাচনের মুখে নির্বাচন কমিশনকে একপ্রকার বুড়ো আঙুল দেখিয়েই কংগ্রেস নেতারা ওই রাজ্যে মুসলমানদের জন্য উপ-সংরক্ষণ সত্ত্ব (সাব-কোটা) চালু করার ব্যাপারে প্রকাশ্যে হুঙ্কার দিচ্ছেন। তোষণ রাজনীতির স্বাধীনতা-উত্তর চিরাচরিত এই ধারার সঙ্গে তসলিমা নাসরিন ও সলমন রুশদি কাণ্ডে অসহিষ্ণুতা আর প্রতিহিংসার রাজনীতি সংখ্যালঘু তোষণের ইতিহাসে নবতর এক কলঙ্কিত অধ্যায়ের সূচনা করল।

এসব নিয়ে লিখেছেন ঃ— **ডঃ স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ, ডাঃ প্রবীণভাই তোগাড়িয়া, ডঃ দীনেশ চন্দ্র সিংহ প্রমুখ।**

সঙ্গে থাকছে অন্যান্য আকর্ষণীয় বিষয়।

অসমে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত জুড়ে অপরাধচক্র সক্রিয়

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সীমান্ত রক্ষীদের অতন্দ্র প্রহরা এড়িয়ে অসম লাগোয়া ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে ঢুকে পড়ছে কিছু বিপজ্জনক ভারত বিরোধী। তারা ভারতে ঢুকে প্রধানত তিনটে কাজে সক্রিয় থাকছে। নকল ভারতীয় টাকা বাজারে চালাবার চেষ্টা করছে। নানারকম মাদক দ্রব্যের গোপন ব্যবসা চালাচ্ছে। এছাড়া অস্ত্র আনছে। এই তিনরকম অপরাধচক্রে যুক্ত লোকজন সীমান্ত পেরিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ৪,১৫৬ কিলোমিটার ধরে ছাব্বিশ বছর আগে বেড়া দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। এখনও বেড়া দেওয়ার কাজ শেষ হয়নি। তার ফলে নকল টাকা, মাদক আর অস্ত্রের চোরাচালানের রমরমা ব্যবসা চলেছে সীমান্তের বেড়াবিহীন খোলা এলাকা দিয়ে। আর এই কাণ্ড সবচেয়ে বেশি হচ্ছে অসমে।

সরকারি তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে ২০০৮ সালে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে পাওয়া নকল ভারতীয় টাকার পরিমাণ বিপুল— ১৮, ৭১, ৫০০ টাকা। আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে নকল ভারতীয় টাকা ভারতের বাজারে যথাক্রমে ২০০৯, ২০১০, ২০১১ সালে যা ঢুকেছে বছর অনুযায়ী তার হিসেবটা এইরকম : ২৮, ৪৩, ৩৯০ টাকা, ৩২, ২৬, ৯০০ টাকা, আর ২০১১-এর অক্টোবর পর্যন্ত মিলেছে ৩৬, ৬১, ৮০০ টাকা। এছাড়া সীমান্ত পথে অস্ত্রশস্ত্রও ঢুকছে প্রচুর পরিমাণে। ধরা পড়েছে পাহারাদের হাতে ক'টি? ২০০৮ সালে দশটি, ২০০৯ সালে ৬৫টি, ২০১০-এ ৭০টি আর ২০১১-র অক্টোবর পর্যন্ত ৪২টা। ভারত-বিরোধী কাজকর্মে যুক্ত থাকার দরুন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে এই ক'বছরে ধরা পড়েছে মাত্র ৫৩ জন।

সীমান্ত রক্ষীদের অনুমান দেশের পক্ষে সব থেকে বিপজ্জনক নকল টাকা। পাকিস্তানে নকল ভারতীয় টাকা ছেপে বাংলাদেশ মারফত ভারতে ঢোকানোর কাজ চলেছে। উদ্দেশ্য, ভারতের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেওয়া।

ভারত ও বাংলাদেশ দু'দেশেই কয়েকটি এলাকা নিজেদের বলে দাবি করছে পরস্পরের কাছে। সীমান্তে এলাকা সঠিক করার জন্যে একদশক আগে বিতর্ক শুরু হয়েছে। নিষ্পত্তি হয়নি এখনও। তারকাঁটার বেড়া দেওয়ার কাজ যখন ভারত সীমান্তে শুরু হয় তখন বাংলাদেশ আপত্তি জানায়। তাদের বক্তব্য ছিল, ভারত যেখান দিয়ে বেড়া দিচ্ছে সেই জায়গাগুলো ভারতের নয়, বাংলাদেশের। এর দরুন বেশ কয়েক জায়গায় বেড়া দেওয়ার কাজ আটকে যায়। আর সেই মুক্ত অঞ্চল হয়ে ওঠে ভারত-শত্রুদের ভারতে ঢুকে পড়ার নিশ্চিন্ত পথ। ভারতের পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে অসমে এর ফলে অনুপ্রবেশ আর চোরাচালান ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

উত্তরপ্রদেশে সংখ্যালঘুদের নিয়ে সাব কোটার বিজ্ঞাপন বাতিল করল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ উত্তরপ্রদেশের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রস্তাবিত সংখ্যালঘুদের সাব কোটা নিয়ে কিস্তিমাত করার কৌশল মাঠে মারা গেল। মিডিয়া সার্টিফিকেশন ও মনিটারিং কমিটি (এম সি এম সি) কংগ্রেসের এই প্রস্তাবিত বিজ্ঞাপনটি বাতিল করে দিয়েছেন।

সম্প্রতি কংগ্রেস দলের তরফে রাজ্য নির্বাচন আয়োগের কাছে উল্লেখিত সংখ্যালঘু সংরক্ষণের 'সাব কোটা' সংক্রান্ত একটি বিশেষ ভিডিও ক্যাসেট জমা দেওয়া হয়। বিজ্ঞাপনে বিপুলভাবে প্রচারের উদ্দেশ্যে দল এই ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু এম সি এম সি পত্রপাঠ এই ভিডিও'র সম্প্রচার নাকচ করে দিয়েছে। এম সি এম সি-র তরফে ভিডিওটির যথাযোগ্য পর্যালোচনার পরই এই নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্বাচন সম্পর্কিত বিজ্ঞাপনটি বাতিল হওয়ার পর উল্লেখিত ভিডিওটির প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য দল উঠে পড়ে লেগেছে। উত্তরপ্রদেশে গত ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে অনুষ্ঠিত ৭ দফার নির্বাচনে সংখ্যালঘু সংরক্ষণের সাব কোটা বিষয়টি ব্যাপকভাবে বিজ্ঞাপিত না হলে দলের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। নির্বাচন আয়োগ ইতিপূর্বেই ইউ পি এ সরকারকে মুসলিম সংরক্ষণের সাব কোটার বিষয়টি নির্বাচন শেষ যাওয়া অবধি স্থগিত রাখার ব্যাপারে আদেশ জারি করতে বলেছিল।

ইতিমধ্যে ফারাকাবাদে স্ত্রীর জন্য নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী সলমন খুরশিদ আগবাড়িয়ে প্রস্তাবিত ৪.৫ শতাংশ সাব কোটাকে দ্বিগুণ করে ৯ শতাংশ করার ঘোষণা করে দিয়েছেন। অবাক করার বিষয় হলো নির্বাচন আয়োগের ঘোষিত নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও পার্টির মাতব্বর নির্বাচন প্রচারকারীরা মুসলিম তোষণ করতে সাব কোটার বিষয়টি কাগজে কলমে চূড়ান্ত হয়ে গেছে,— এমনই হুঙ্কার ছেড়ে যাচ্ছেন।

সঙ্ঘের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেননি হাজারে : শ্রীভাগবত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ এটা ঠিক যে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকেরা ব্যক্তিগতভাবে আন্না হাজারের নেতৃত্বাধীন সজ্জন সমাজের (সিভিল সোসাইটি) দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু শ্রী হাজারে এই তথ্যটিকে স্বীকার না করাতেই তাঁকে আজ প্রতিবাদ করতে হচ্ছে। গত ৫ ফেব্রুয়ারি পাটনাতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত শ্রী হাজারের নীরবতা নিয়ে এভাবেই নিজেদের অবস্থানের কথা জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, সঙ্ঘ নির্দেশ না দিলেও সারা দেশ জুড়ে স্বয়ংসেবকেরা স্বেচ্ছায় দুর্নীতি বিরোধী এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন। অথচ কংগ্রেস যখন এটাকে ইস্যু করে শ্রী হাজারেকে আক্রমণ করে তখন তিনি নীরব ছিলেন। এজন্যই আজ মুখ খুলতে হচ্ছে শ্রী ভাগবত স্পষ্টভাবেই জানান যে সজ্জন সমাজের দুর্নীতি বিরুদ্ধে আন্দোলনে আর এস এস অংশগ্রহণ করেনি। যদিও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সঙ্ঘ একই মনোভাব পোষণ করে এবং গত মার্চ মাসে অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভা এই মর্মে একটি প্রস্তাবও গ্রহণ করেছে। তিনি বলেন, এই রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শুধু সরকারি পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলেই দুর্নীতি দূর হবে না। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন নির্বাচনী সংস্কার এবং বিভিন্ন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতাও আনতে হবে।

ভুটানে দুর্ব্যবহারের শিকার হিন্দুরা

সংবাদদাতা॥ ভারতের লাগোয়া বৌদ্ধ রাজ্য (স্বাধীন দেশ) ভুটান এখন মাদ্রাসা-মৌলবী ও খৃস্টান মিশনারীদের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। ফল অবশ্যই ভারত এবং ভারতবাসীদের ভুগতে হচ্ছে এবং হবে। ভুটান লাগোয়া ভারতভূখণ্ড জয়গাঁ। জয়গাঁয় বর্তমানে মুসলিম মৌলবাদীদের দাপট বিগত কয়েক বছরের বিভিন্ন ঘটনায় বার বার দেখা গেছে। সামান্য কারণে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও হিন্দুদের ঘরবাড়ি দোকান লুঠপাটের ঘটনা ঘটছে—দু'বছর আগে থেকেই। বাংলাদেশী মুসলিমদের নিরাপদ আস্তানা হয়ে উঠেছে ছোট্ট সীমান্তবর্তী শহর জয়গাঁ। ওখানেই বিগত কয়েক বছরে গজিয়েছে ৪৫টি চার্চ, ১৭টি মসজিদ এবং ১৫টি মাদ্রাসা। যা অদূর ভবিষ্যতে ভারতের জন্য চরম মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠবে এবং এখনই তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল।

ভুটান-এর বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় সাত লক্ষ। সামাজিক দিক থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হয়েই রয়েছে। ভুটানের এলাকা ৪৬,৫০০ বর্গকিমি.। পাঁচটি জোন-এ কুড়িটি জেলা। কুড়িটি জেলার মধ্যে মাত্র সাতটি জেলায় সনাতন হিন্দুদের বসবাস। ওই সাতটি জেলার লোকসংখ্যা প্রায় দু'লক্ষ। 'ভুটান'-এর কথা বললেই ওখানকার বৌদ্ধরা গর্বভরে বলেন, ড্রুগ-ড্রুপ্পা-ড্রাগন। 'ড্রুগ' হলো ভুটানের প্রাচীন নাম। 'ড্রুপ্পা'-র অর্থ 'ড্রুপ' দেশে বসবাসকারী বৌদ্ধ সমাজ। 'ড্রাগন' ভুটানের রাষ্ট্রীয় প্রতীক—একসময় চীনেরও ওই একই রাষ্ট্রীয় প্রতীক ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে তিব্বত থেকে সবদুঙ্গলামা নামে একজন বৌদ্ধ লামা ভুটানে এসেছিলেন। ওখানের স্থানীয় অধিবাসীদের তিনি লামা ভাষায় লেখাপড়া শেখান। পরে তাঁদেরকে সংস্কার প্রদান করে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেন। ওই জনসমাজ পরে 'সারছোপ্পা' নামে পরিচিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর সবদুঙ্গলামাকে সারছোপ্পা সমাজ এখনও অবতার-এর সমান মর্যাদা, সম্মান দেয়। এঁরা সবাই ভুটানের পূর্বাঞ্চলের পাঁচটি জেলাতে বসবাস করে।

ভূটানের বর্তমান রাজপরিবার ১০৫ বছর আগে তিব্বত থেকে ভূটানে এসেছিলেন। এখনও পর্যন্ত মাত্র পাঁচজন 'রাজা' ভুটানের রাজসিংহাসন আলোকিত করেছেন। প্রথম রাজা জিগমে ওয়াংচুক, দ্বিতীয় উগেন ওয়াংচুক, তৃতীয় জিগমে দোরজি ওয়াংচুক, চতুর্থ রাজা জিগমে সিংগ ওয়াংচুক, বর্তমান পঞ্চম রাজা খেসার নামগিয়াল ওয়াংচুক। ঘোষিত বৌদ্ধরাজত্ব ভুটানে রাজবংশীয় বৌদ্ধ, সারছোপ্পা বৌদ্ধ এবং ওখানকার আদি অধিবাসীরা আছেন। এছাড়া রয়েছেন নেপালীভাষী লৌহছম্পাস বৌদ্ধ। এঁদের সকলের মোট সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার লক্ষ। এছাড়া দুই লক্ষ-এর মতো নেপালীভাষী ও হিন্দীভাষী সনাতন-ধর্মীয় হিন্দুরাও আছেন। আরও অতিরিক্ত ৬০ হাজার ধর্মান্তরিত মুসলমান ও খৃস্টান ভুটানে বসবাস করেন।

ভুটানে জোরকদমে মুসলমান অনুপ্রবেশ এবং খৃস্টান ও মুসলিম মতে ধর্মান্তরকরণ হয়ে চলেছে। এর পিছনে এক গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। দেখেশুনে মনে হয় ধর্মান্তরকরণের পিছনে রাজ-কৃপা আছে। ভুটানে বৌদ্ধ গুম্ফা বাদ দিলে বিশেষ কোনও সনাতন ধর্মীয় মন্দির নজরে পড়ে না।

ভুটানের সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক সম্বন্ধ বেশ মধুর। বন্ধুত্বপূর্ণ। কিন্তু ব্যবহারিকভাবে ওখানে বসবাসরত সনাতন হিন্দুসমাজের সঙ্গে ব্যবহার অন্যরকম। প্রায় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। এই বিদ্বেষ ও উৎপীড়ন দু'দেশের মধ্যে কটুতা সৃষ্টি করতে পারে। ভুটান পর্যটনের পর বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যকর্তা আনন্দ প্রকাশের অভিমত এরকমই। অথচ সনাতন হিন্দু সমাজ ওখানের আর্থিক উন্নয়নে সর্বতোভাবে সংযুক্ত—একরকম ভিত্তিস্বরূপ বলা যেতে পারে। পদে পদে তারা অবিচার, উৎপীড়ন ও অপমানের শিকার।

ভারত সরকারের এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা উচিত বলে পরিষদের ওই কার্যকর্তা জানিয়েছেন। যদিও ভুটানে ২০০৯-এ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহারাজা নিজেই গণতন্ত্র ঘোষণা করে দিয়েছেন। নির্বাচিত সরকারই প্রশাসন চালাচ্ছে। বর্তমানে সরকারপক্ষের কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই।

এই বকচ্ছপ ব্যবস্থার সমাধান করা একান্ত প্রয়োজন বলে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা মনে করেন।

নয়াদিল্লীতে গত ৫ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা পরমপূজনীয় ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের আবক্ষ মূর্তির উন্মোচনে বিজেপির প্রবীণ নেতা লালকৃষ্ণ আদবানী।

রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা ঢাকতে

কেন্দ্রকে দোষী সাব্যস্ত করার কমিউনিস্ট উত্তরাধিকার কি এবার মমতার হাতে?

নিশাকর সোম

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যভবনে এক পুরস্কার বিতরণী সভায় যে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিয়েছেন, তা হুবহু এক দৈনিক থেকে উদ্ধৃত করছি— পাঠকদের বিবেচনার জন্য। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন— ‘‘শিশুমৃত্যুর কারণ বাম জমানায়। যে শিশুরা এখন হাসপাতালে আসছে, তাদের মায়েরা ১০ মাস আগে গর্ভবতী হয়েছিল। আমার সরকারের তো ১০ মাস বয়স হয়নি। ডোন্ট ফরগেট ইট। একটা প্রগতিশীল সরকার ৩৪ বছরে যা করেনি, তা কীভাবে একটা সরকার করবে? এটা কি আলাদিনের ৪০ প্রদীপ নাকি? কিছু সাংবাদিক না বুঝে ধেই ধেই করে নৃত্য করছে। আসল সত্য লিখুন। আগে সাংবাদিকরা পড়াশুনা করতেন। এখন তাও করেন না। সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে। ফিনাইলের বোতলে অ্যাসিড মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে।’’

রাজ্য রাজনীতি

মুখ্যমন্ত্রীর উপরোক্ত বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে যে— (১) যে শিশুরা এখন জন্মাচ্ছে, তাদের গর্ভাধান বামফ্রন্ট সরকারের আমলে হয়েছিল। অতএব তখন থেকেই এই শিশুরা মৃত্যুদূষণ পেয়েছিল— বাম সরকারের দুর্নীতির জন্য? (২) সাংবাদিকগণ এখন নাকি সত্য কথা লিখছেন না? সাংবাদিকগণ এখন পড়াশুনা করেন না। তারা ধেই ধেই করে নৃত্য করছে? সাংবাদিকদের কি প্রকারান্তরে মুর্খ বলা হলো? (৩) ‘‘আলাদিনের ৪০ প্রদীপ’’ বলে কিছু জানা নেই। আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ-এর কথা আছে। এছাড়া ‘‘আলিবাবা ও চল্লিশ চোর’’-এর কথা শোনা আছে।

মুখ্যমন্ত্রী ইতিপূর্বে বলেছিলেন, ‘‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেবুর রস খাইয়ে গান্ধীজির অনশন ভঙ্গ করিয়েছিলেন! বক্তব্যের মধ্যে এক জায়গায় তিনি বলেছেন, ‘আমার সরকার’। এতো ভারি মজার কথা। সরকারটা কি তিনি বসিয়েছেন? না এটা সাধারণ মানুষ সিপিএম-কে দূর করে তাঁকে বা তাঁদের বসিয়েছেন। একমাত্র রাজ্যপাল বিধানসভায় বক্তব্য পেশ করার সময় বলেন, ‘মাই গভর্মেন্ট’।

মুখ্যমন্ত্রী সমালোচনাকারীদের কুৎসা-শিল্পী বলেছেন। বারবার বলছেন, ৩৪ বছর যারা কিছু করেনি, তারা চুপ করে থাকবে। রাজ্য সরকারের শ্রমমন্ত্রী রাজ্যের শ্রমনীতি নিয়ে কথা বলেছেন। একদা অগ্নিস্রাবী নেতা বলেছেন— ‘‘সরকারি কর্মচারীদের মনে রাখতে হবে, মহাকরণ কারখানার গেট নয়। সরকারি কর্মচারীদের ইউনিয়নবাজি করা চলবে না।’’ তিনি এক শিল্পে একটি ইউনিয়ন থাকবে বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি আরও বলেছেন— ‘‘ভাল কাজের জন্য পুরস্কার, খারাপ কাজের জন্য তিরস্কার। সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন কর্তাদের কাজ সম্পর্কে অনুসন্ধান করা হবে।’’ প্রশ্ন হলো— সরকারি কর্মীদের উপর শাস্তির খাঁড়া নামবে কি? ইউনিয়ন ভাঙা হবে কি? মন্ত্রী বলেছেন,— ‘‘পরিবহন-কে একটি নিগমের অধীনে আনা হচ্ছে। পরিবহনে পরাজিত প্রাক্তন পরিবহনমন্ত্রী শ্যামল চক্রবর্তী সম্বন্ধে তদন্ত করা হবে। ভর্তুকি বন্ধ হবে।’’

এই সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতার পথে হাঁটছে। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী জয়রাম রমেশ-এর ডাকা সম্মেলনে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় গেলেন না— মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে। এই সুব্রত মুখোপাধ্যায়কে একদিন ‘তরমুজ’ নামে অভিহিত করা হয়েছিল। ক্ষমতার লোভে এখন সব উলট-পালট।

মুখ্যমন্ত্রী বারবার কেন্দ্রীয় সরকার তথা মনমোহন সিং-কে অপরাধী করে বলেছেন— ‘‘কেন্দ্র অর্থ বরাদ্দ করছে না। যখন আমরা বামবিরোধী আন্দোলন করছিলাম তখন একবার প্রধানমন্ত্রী আমাদের সাহায্য করেননি। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য-কেই সাহায্য করেছিলেন।’’

কেন্দ্রীয় সরকারের একটি তথ্য দেখে বলা যায় মুখ্যমন্ত্রীর কথা সবটা ঠিক নয়। রেগা (এম এন আর ই জি এ) খাতে ২০১১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত কেন্দ্রের তরফে রাজ্যকে প্রায় ২,৩২৫ কোটি দেওয়া হয়েছে। রাজ্য খরচ করেছে ৪৬.৫ শতাংশ। যেখানে ত্রিপুরার সিপিএম সরকার খরচ করেছে ৭১ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া বিভিন্ন খাতের বরাদ্দ অর্থ ব্যয় করতে ব্যর্থ হওয়ায় সেসব টাকা ফেরত যাচ্ছে। এসব দেখেশুনে জ্যোতি বসুর কথা মনে পড়ে। তিনি খালি বলতেন, ‘কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না, তাই কাজ আটকে গেছে।’ জ্যোতি-বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন ধরে এ সরকার কি পা ফেলতে চায়?

মাস্টারমশাই কেশবচন্দ্র চক্রবর্তীর জন্মশতবর্ষের প্রস্তুতি রাজ্য জুড়ে

রোহিণীপ্রসাদ প্রামাণিক ॥ শ্রদ্ধেয় কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী— সবার প্রিয় আপনজন ''মাস্টারমশায়''। তিনি আর আজ আমাদের মাঝে নেই। নিয়তির নিশ্চিত নিয়মে তাঁর পার্থিব দেহ বিদায় নিয়েছে ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯-তে। গত ২০১২-র ৪ ফেব্রুয়ারি শিবপুর শ্মশানঘাটে তাঁর ক্ষুদ্র এক স্মৃতিস্তম্ভের তলে বসে স্মৃতিচারণাতে ভেসে উঠেছে তাঁর বিশাল এক কর্মময় জীবনের অসংখ্য তরঙ্গমালা। প্রদেশব্যাপী শুরু হয়েছে তাঁর শতবর্ষের জন্মজয়ন্তী। অসংখ্য গুণমুগ্ধ মানুষদের মধ্য থেকে কিছু উৎসাহ ব্যক্তিত্বকে নিয়ে গঠিত হয়েছে ''কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী শতবর্ষ উদযাপন সমিতি পশ্চিমবঙ্গ।''

বাংলার প্রতিটি জেলাতে এক বা একাধিক স্থানে বর্ষব্যাপী (১ ডিসেম্বর ২০১১ থেকে ১ ডিসেম্বর ২০১২) সেবা, সংস্কার, শিক্ষা, সংস্কৃতি, নাগরিক, মাতৃশক্তি, পরিবার-প্রেরণা ইত্যাদি নানান বর্ণময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ''মাস্টারমশায়ের'' বহুমুখী প্রতিভা অবলম্বনে তুলে ধরা হচ্ছে তাঁর কর্মময় এক জীবনকে।

গত ৪ ফেব্রুয়ারি শিবপুর শ্মশানঘাটে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে মাস্টারমশায়ের স্মৃতিবেদীতে মাল্যার্পণ করা হয়। সংগঠনগুলির মধ্যে অন্যতম রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, বিবেকানন্দ বিদ্যাবিক্যাশ পরিষদ, বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি, বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, সংস্কার ভারতী ও কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী শতবর্ষ উদযাপন সমিতি। গীতাপাঠ, একক গীত, মাল্যার্পণ, স্মৃতিচারণ ও সঙ্ঘের প্রার্থনার মাধ্যমে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে কার্যক্রমটি সমাপ্ত হয়। অনেক গুণীজনেরা ওই কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন। এইসব কার্যক্রমগুলি যে আমাদের সবার কাছে প্রেরণা জোগাবে এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। এই উপলক্ষে তাঁর প্রেরণাময় জীবনের অল্প কিছু কথা সবার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আশা করি শুধু ব্যক্তি হিসাবে নয়, ব্যক্তির মাধ্যমে আদর্শের যে প্রেরণা তিনি রেখে গেছেন সবার সামনে— তাই আমাদের সকলের কাছে হবে চলার পাথেয়।

খালি গায়ে খালি পায়ে একটি ছেলে এসে দাঁড়াল স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যক্ষের সামনে। বললে, আমি কলেজে পড়তে চাই, তবে মাইনে দেওয়ার সামর্থ্য নেই। অধ্যক্ষের সাফ জবাব, তা হলে হবে না। দ্বিতীয়বার কোনও অনুরোধ-উপরোধ না করে ছেলেটি চলে যেতে উদ্যত হলো। অধ্যক্ষ অবাক হলেন ছেলেটির তেজোদীপ্ত আচরণ দেখে। হয়ত বা মুগ্ধও। ডেকে ভর্তি করে নিলেন। সংকল্প-দৃঢ় এই কিশোর কেশবচন্দ্র চক্রবর্তীর জন্ম অধুনা বাংলাদেশের যশোরের বারুইখালি গ্রামে প্রাথমিক পাঠ পিতা প্রিয়নাথ সাংখ্যতীর্থ-র টোলেই, কৃতিত্বের সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ বর্ধমান থেকে, তারপর শুধুমাত্র মনের বল সঞ্চয় করে কলকাতায় আসা। ১৯৩৬-এ প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় হয়ে সংস্কৃতে এম এ। ইতিমধ্যে ঢাকার সারস্বত সমাজ থেকে 'কাব্যরত্ন' উপাধি লাভ এবং 'কাব্যতীর্থ' উপাধি অর্জন।

অন্য কোনও চাকরি নয়, বিদ্যাদানের পবিত্র কর্মই হোক পেশা, এই ছিল পারিবারিক ইচ্ছা। জুটেও গেল হাওড়ার শিবপুর দীনবন্ধু ইনস্টিটিউশনে 'মাস্টারি'। স্কুল থেকে গেছেন হাওড়া গার্লস কলেজে (অধুনা বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ) উপাধ্যক্ষ হয়ে। শেষে অধ্যক্ষও ছিলেন বেশ কয়েক বছর। কী স্কুলে, কী কলেজে তাঁর সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনচর্যা, স্নেহ-মাধুর্যে মাখা স্বভাবের কোনও পরিবর্তন হয়নি। বাইরে থেকে বোঝার উপায় ছিল না কী অগাধ পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানের অধিকারী তিনি।

'মাস্টারমশাই' রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসেন ১৯৪৪ সালে। প্রথম দর্শনেই তিনি সঙ্ঘকে ভালবেসে ফেলেছিলেন। 'প্রচারক' তিনি হননি, কিন্তু পরিপূর্ণ গৃহস্থ হয়েও জীবনকে কীভাবে সঙ্ঘময় করে তোল যায় তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করে গেছেন। প্রথমে হাওড়ার কার্যবাহ, তারপর ধাপে ধাপে বিভিন্ন স্তরে সঙ্ঘচালকের দায়িত্ব পালন করে শেষে ১৯৬৯ সালে প্রথম প্রদেশ সঙ্ঘচালক হন। সঙ্ঘের কাজে রাজ্যের সর্বত্র তিনি ঘুরেছেন। সঙ্ঘের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিচালনায় সর্বসাধারণের কল্যাণে হাতে নেওয়া সকল কর্মসূচিতেই ছিল তাঁর সক্রিয় সহযোগ। বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির সভাপতি হিসাবে '৪৭-এ পূর্ববঙ্গের ছিন্নমূল হিন্দুদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, '৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় অসুস্থ শরীরেও নিয়মিত গেছেন সীমান্তের ত্রাণশিবিরগুলিতে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর গেছেন ঢাকা, বরিশাল, যশোর ও খুলনায়, বিধ্বস্তদের পুনর্বাসনে তুলে দিয়েছেন সাহায্য-সামগ্রী। রাজ্যে যেখানে যখন খরা, বন্যা হয়েছে, ছুটে গেছেন সেবাব্রতী স্বয়ংসেবকদের উৎসাহ দিতে।

দেশ ও সঙ্ঘের স্বার্থে দু'বার তাঁকে কারাবাসও করতে হয়েছে। প্রথমবার '৪৮ সালে মহাত্মা গান্ধী নিহত হওয়ার পর সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করা হলে, ১৬ দিনের জন্য। দ্বিতীয়বার '৭৬-এ জরুরি অবস্থা ও সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিতে সত্যাগ্রহে যোগ দিয় ১৪ মাস।

১৯৭৯-এর জানুয়ারিতে প্রয়াগে কুম্ভমেলায় গিয়েছিলেন বিশ্ব হিন্দু সম্মেলনে যোগ দিতে। ফিরে তাঁর উৎসাহ যেন বেড়ে গিয়েছিল অনেক গুণ। সবাইকে ডেকে বলছিলেন, কাজ বাড়াও, আমাকে যেভাবে কাজে লাগাতে চাও লাগাও। বিধাতার কী নিষ্ঠুর বিধান, দিন কয়েকের মধ্যেই (৪ ফেব্রুয়ারি) কিনা তাঁকে কাছে টেনে নিলেন।

লেখায় বলায় সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজি তিন ভাষাতেই ছিল তাঁর সমান দখল। বক্তব্য হোত বিষয়-বৈচিত্র্যে নিত্য নতুন। লেখার অবসর কম পেলেও তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধ, কবিতা ও গান প্রকাশিত হয়েছে। অপ্রকাশিত রয়ে গেছে অনেক।

শিক্ষা ও সমাজকর্মে মাস্টারমশাইয়ের সমগ্র জীবন ছিল সমর্পিত। লিখেছিলেন, ''তোমার কাজে জীবন দিব কথা দিলাম রাজার রাজা.......''। কথা তিনি সত্যিই রেখেছেন।

মাস্টারমশাইয়ের জন্মশতবর্ষ পালনের জন্য গঠিত কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী শতবর্ষ উদাপন সমিতি তার বর্ষব্যাপী কর্মসূচিতে সকলের সর্বপ্রকার সহযোগিতা কামনা করে।

ভারতের গণতন্ত্র কি সত্যিই গণতন্ত্র ?

ডঃ নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত

আমাদের সংবিধান রচিত হওয়ার সময় যে স্বপ্নগুলো জানা ছিল, তার মধ্যে গণতান্ত্রিক আদর্শের কথাও ছিল। এর মূল কথা হলো— ব্যক্তি-স্বাধীনতা (liberty), সাম্য (equality), সহিষ্ণুতা (tolerance) ইত্যাদি। সর্বোপরি রয়েছে জনগণের সার্বভৌমিকতা। কথাটা এসেছে demos (জনগণ) ও 'kratic' (করবার) থেকে।

কিন্তু আমাদেরটা কি গণতন্ত্র?

আমাদের কোনও কোনও নেতা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি বুঝেছিলেন, কে জানে! ১৯৫৯ সালে অর্থমন্ত্রী সি ডি দেশমুখ সর্বপ্রথমে আমাদের দেশে এম্বুডস্ম্যান-ধাঁচের লোকপাল-পদ সৃষ্টির কথা তোলেন। তারপর রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদও একটা চিঠির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে এই ব্যাপারে অনুরোধ করেছিলেন।

১৯৬৩ সালে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি পি বি গজেন্দ্রগাদকারও মন্তব্য করেছিলেন যে, এই ধরনের একটা পদ তৈরি করা দরকার দুর্নীতিকে রোধ করার জন্য। অবশ্য সংসদে এই দাবিটা উঠেছে আরও পরে। ১৯৬৩ সালে সাংসদ ডঃ এল. এম. সিংভী এই পদ সৃষ্টির জন্য দাবি জানিয়েছিলেন। আর তারপর 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস্ কমিটি' (ARC) এবং অ্যাটর্নি-জেনারেল শীতলবাদও এই দাবি তুলেছিলেন। এত কিছুর ফলে তখন বোঝা গিয়েছিল যে ওপরমহলের দুর্নীতিকে দূর করার জন্য লোকপাল পদের সৃষ্টি একটা অপরিহার্য ব্যাপার। কিন্তু সরকার তখনই তৎপর হয়নি কোনও অজ্ঞাত কারণে।

প্রথমবার লোকপাল বিল আনা হয় ১৯৬৯ সালে সেটা লোকসভায় পাশও হয়ে যায়। কিন্তু সেটা রাজ্যসভায় পেশ হওয়ার আগেই চতুর্থ লোকসভাকে ভেঙে দেওয়া হয়— ফলে ওই বিল নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি।

১৯৭১ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর এই বিল দ্বিতীয়বার পেশ করা হয়। কিন্তু সেটাও বেশি দূর এগোয়নি, কোনও সিলেক্ট কমিটির কাছেও পাঠানো হয়নি— হিমঘরে চলে যায় বিলটি। তৃতীয়বার বিলটা আনা হয় জনতা আমলে। যৌথ সিলেক্ট কমিটির কাছে সেটা পাঠানো হলেও আবার লোকসভাকে ভেঙে দেওয়া হয়— ফলে বিলটার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে।

১৯৮৫ সালে চতুর্থবার বিলটা লোকসভায় তোলা হয়, কিন্তু তার ভাগ্যটিও ছিল আগের মতো মর্মান্তিক। নানা কারণে বিলটা প্রত্যাহার করা হয়েছিল এবারেও।

পঞ্চমবার এই বিল তোলা হয়েছিল ১৯৮৯ সালে— তবে সেটাও অচিরে হিমঘরে চলে গিয়েছিল।

১৯৯৬ সালে ষষ্ঠবার বিলটাকে উত্থাপন করা হয়েছিল, সেটা সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছেও গিয়েছিল। কিন্তু কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই মুলতুবী করা হয় লোকসভাকে। সুতরাং সেবারও পদটা সৃষ্টি করা যায়নি।

এন ডি এ সরকারের আমলে সপ্তমবার এই বিল আবারও তোলা হয়েছিল— কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার কোনও গতি হয়নি।

এবার পঞ্চদশ লোকসভার আমলে আবার উঠেছিল এই বিল, লোকসভায় সেটা গৃহীতও হয়েছিল। কিন্তু রাজ্যসভায় সেটা আদৌ পাশ হবে না বুঝে সরকার সেটা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। সেটা বাজেট-অধিবেশনে আবার তোলার কথা।

আরও একটা সমস্যা আছে— সেটা হলো মুখ্যতন্ত্রের (মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত শাসনতন্ত্র) মূর্খতন্ত্র হয়ে ওঠার ঝোঁক। আগে কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতা গুণ্ডাদের সাহায্যে কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করত, এখন কিছু গুণ্ডা নেতা হওয়ার উদ্যোগ নিয়ে থাকে। তাই এখন নির্বাচনী রাজনীতি ব্যালটের বদলে বুলেট নির্ভর হতে চলেছে। সংবাদপত্রে দেখলাম, পাঁচটা রাজ্যে নির্বাচন আসন্ন হয়ে ওঠায়

এই টালবাহানা ও অস্থিরতা থেকে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে— সরকার এই ব্যাপারে আদৌ আন্তরিক নয়। তাছাড়া বিরোধীদের সঙ্গে সরকারের মতপার্থক্য যেমন আছে, তেমনি বিরোধীদের মধ্যেও রয়েছে প্রবল মতভেদ। বিশেষ করে, সরকার বারবার পিছিয়ে গিয়েছে একটা ব্যাপারে --- প্রধানমন্ত্রীকে লোকপালের আওয়তায় আনার ব্যাপারে বারবার বিভিন্ন সরকার আপত্তি জানিয়েছে, যেন তিনি কোনও দুর্নীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষ দিক থেকে জড়িত হতেই পারেন না! বিদেশের কথা ভাবা যাক। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন, বৃটিশ মন্ত্রী প্রফুমো, ইজরায়েলের রাষ্ট্রপতি মনহে কাটসভ, ইটালীর প্রধানমন্ত্রী সিলভিও বার্লুসকনি প্রমুখকে পদত্যাগ বা শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে ভ্রষ্টাচারের দায়ে। তাহলে আমাদের প্রধানমন্ত্রী লোকপালের ধরা-ছোঁয়ার

রাম মন্দিরের প্রতিজ্ঞা

সম্প্রতি অযোধ্যায় আয়োজিত একটি মিছিলে ভাষণ দিতে গিয়ে লালকৃষ্ণ আদবানী রামমন্দির নির্মাণে তাঁদের প্রতিজ্ঞার কথা ব্যক্ত করেন। তিনি জানান, মানুষের 'সেন্টিমেন্ট'কে গুরুত্ব দিতেই এই 'তাৎপর্যপূর্ণ' মন্দিরটি নির্মাণ করা উচিত। এব্যাপারে তাঁর দল যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তা-ও বলেন তিনি। এলাহাবাদ হাইকোর্টের রামমন্দিরের সপক্ষে রায়ের পর দেশের জনমানসে মন্দির নির্মাণের জন্য যে আলোড়ন উঠেছে, আদবানীর বক্তব্য তারই প্রতিফলন বলে মনে করা হচ্ছে।

দেশের নিরাপত্তায়

দেশের নিরাপত্তায় বেশ বড়সড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র। নাশকতা- বিরোধী সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে ন্যাশনাল কাউন্টার টেররিজম সেন্টার বা এন সি টি সি। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী পদক্ষেপটি নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এন সি টি সি-কে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ ক্ষমতা; যে ক্ষমতাবলে গ্রেপ্তার, তল্লাশী এবং বাজেয়াপ্ত করার অধিকার এদের হাতে থাকবে। প্রসঙ্গত, গত জানুয়ারিতেই নিরাপত্তা বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি এন সি টি সি-র ব্যাপারে অনুমোদন দিয়েছিল।

নির্বাচনী আসরে যোগী আদিত্যনাথ

২০০২ সালে যোগী আদিত্যনাথ হিন্দু যুবকদের ঐক্যবদ্ধ করে গড়ে তুলেছিলেন হিন্দু যুববাহিনী। প্রতিষ্ঠালগ্নের পর নেপালের উত্তাল সময়ে, নেপালের মাওবাদীদের বিরুদ্ধে 'হিন্দুরাষ্ট্র' রক্ষায় তাঁর দলের আন্দোলন চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই যোগীর দলের ডালপালা গোরখপুর, কুশিনগর, সিদ্ধার্থনগর সহ পূর্ব উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জেলায় ক্রমশ ছড়াচ্ছিল। আর এবারেই প্রথমবারের জন্য উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে নামছে হিন্দু যুব বাহিনী। বিজেপি-র টিকিটে দলের প্রদেশ প্রভারী (রাজ্য প্রধান) রাঘবেন্দ্র প্রতাপ সিং দোমারিয়াগঞ্জ কেন্দ্রে বি এস পি ও পীস পার্টির দুই মুসলিম প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন। নির্বাচনী বিশ্লেষকদের মতে, এক-আধটা আসনে নয়, যোগী আদিত্যনাথ নির্বাচনী আসরে নামায় তার প্রভাব গোটা উত্তরপ্রদেশেই পড়বে।

এই সময়

বৃটিশ গাত্রদাহ

'সমৃদ্ধ' ভারতবর্ষের দিকে কেন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে বৃটিশ সরকার, এমনই প্রশ্নে উত্তাল বৃটিশ মিডিয়া ও বৃটিশ জনগণ। নানা ঝামেলায় ব্যতিব্যস্ত ক্যামেরন সরকার যখন চাপ কমাতে চাইছে, তখন এহেন প্রশ্ন তাদের যে আরও গাড্ডায় ফেলবে একথা বলাই বাহুল্য। বিশেষ করে ভারত টাইফুনের পর ফরাসী যুদ্ধ-বিমান রাফায়েল তুলে নেওয়ায় বৃটিশ মিডিয়া দেখছে, জ্বলছে আর লুচির মতো ফুলছে! কারণ রাফায়েল যে অংশত বৃটেনেই তৈরি হয়! একদা তাদেরই অধীনে থাকা দেশের এতটা বেয়াদপি কখনও সহ্য হয়? বিশেষ করে বিলিতি সাদা চামড়াদের!

গুহায় অস্ত্র

জম্মু-কাশ্মীরের ডোডা জেলায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অতি উচ্চ উচ্চতায় পাহাড়ের গুহায় তল্লাশি চালিয়ে নিরাপত্তারক্ষীরা ৫টি অত্যাধুনিক অস্ত্র সহ ১৫০০ রাউন্ড গুলি, ১১০টি বিস্ফোরক এবং ৫ কেজি আর ডি এক্স উদ্ধার করেছেন। পাহাড়ের ওই অত উচ্চতায় এত বেশি পরিমাণ অস্ত্র স্বাভাবিকভাবেই কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের। সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের ১০ নম্বর ব্যাটেলিয়ন দেসা এলাকায় মানসু নাল্লা-র ওই গুহায় তল্লাশি চালায়। আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, তল্লাশি চালানোর আগে গুহাটি অরক্ষিত-ই ছিল। সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে এই অস্ত্র-শস্ত্র উদ্ধারকে অন্যতম বৃহৎ বলে তাঁরা মন্তব্য করেছেন।

সন্ত্রাস চালানোর অর্থ

নালন্দা থেকে সম্প্রতি গ্রেপ্তার হওয়া সিমি'র পূর্বতন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য মহম্মদ তারিক জেরার মুখে স্বীকার করেছে তারা এখন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের ছত্রছায়ায় কাজ করছে। তারিকের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সে দিল্লী ও দেশের অন্যান্য প্রান্ত থেকে তরুণদের সংগ্রহ করে সিমির সদস্য করত। এরাই এখন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের বকলমে ডাকাতি ও অপহরণের মাধ্যমে মুক্তিপণ আদায় করছে। সংবাদ আরও প্রকাশ ২০১১-র মধ্যপ্রদেশের অ্যান্টিটেররিস্ট স্কোয়াড ৪ সদস্যের একটি দলকে ২.৫ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ডাকাতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। তদন্তে প্রকাশ এই দলটির গ্রেপ্তারী এড়ানো অধিকাংশ সদস্যই পরবর্তীকালে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের হয়ে কাজ করছে। উভয়েরই কর্ম পদ্ধতি এক। পুলিশি তদন্তে চাঞ্চল্যকরভাবে প্রকাশ পেয়েছে মুম্বাই বিস্ফোরণ কাণ্ড সহ সাম্প্রতিককালে সংগঠিত হওয়া সিংহভাগ বিস্ফোরণের আগাম সমস্ত খবরই তারিকের গোচরে ছিল।

এখন কলকাতা

গত ৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় 'এখন কলকাতা' নামে একটি বাংলা নিউজ ওয়েব সাইট-এর উদ্বোধন করেন কে এম আর সি-র ম্যানেজিং ডাইরেক্টার সুব্রত গুপ্ত। কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী মুকুল রায় খুব কম সময়ের জন্য হলেও এসে ঘুরে গেছেন। প্রবীণ সাংবাদিক শঙ্কর ভট্টাচার্য বর্তমান সাংবাদিকতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। সংস্থার পক্ষে সকলের কাছে সহযোগিতা প্রার্থনা করেন দিবাকর রায়। গঙ্গাবক্ষে ফ্লোটেল-এ অনুষ্ঠিত এই সভায় কলকাতার বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন।

বাইরে থাকবেন কেন? আরও জানা গিয়েছে যে— সাংসদ, বিচারক, ছোট আমলা, সি বি আই ইত্যাদিকে লোকপালের আওতায় আনা হবে কিনা— এটা নিয়েও বিরাট মতানৈক্য হয়েছে এবার।

মোটকথা, বারবার চেষ্টা করেও লোকপাল বিল গ্রহণ করা যায়নি। মনে হয় একটা বড় অংশ চায় না যে, একটা শক্তিশালী ও কর্মক্ষম লোকপাল পদ তৈরি হোক। এর জন্য প্রধানত দায়ী সরকারের ঔদাসীন্য ('callous indifference') (ডঃ জে. সি. জেহারী— ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স,পৃঃ ৭৯৩)। এম সি জৈন কাগ্‌জীও এই ব্যাপারে সরকারের সদিচ্ছার অভাবের কথা বলেছেন— (দ্য ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ল, পৃঃ ১৭৮)। মনে হয় অনেকেই চান দেশটা যেমন দুর্নীতির পঙ্ককুণ্ডে ডুবে আছে, তেমনই থাকুক।

দ্বিতীয় বিষয়টাও কম পীড়াদায়ক নয়। হিসেবে দেখা যাচ্ছে— কেন্দ্রের ৭৭ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৫৯ জনই কোটিপতি। তাছাড়া গত দুই বছরে তাঁদের গড় সম্পত্তির পরিমাণ ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বেড়েছে। এর মধ্যে একজন মন্ত্রীর সম্পত্তির পরিমাণ নাকি ১২২ কোটি টাকা। অন্য একজনের সম্পত্তি আছে ৭০ কোটি টাকার। কমলনাথের সম্পত্তির পরিমাণ নাকি ৪১ কোটি টাকা।

দেশের মানুষের একটা বিরাট অংশ যখন দারিদ্র্য-সীমার নিচে বাস করেন, তখন ৫৯ জন মন্ত্রী কোটি টাকার সম্পত্তি কেমন করে করেন, দুই বছরে ৩ কোটি টাকার সম্পত্তি কিভাবে বেড়ে যায়— জানি না! এতেই মনে হয়, আমরা যতই গণতন্ত্রের কথা বলি— আসলে এটা একটা 'অলিগার্কি' বা মুখ্যতন্ত্র (মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত শাসনতন্ত্র), শাসকরাই আসল অর্থশক্তির ভিত্তি।

তৃতীয়ত, তাঁদের মধ্যে রয়েছে একটা বড়লোকি ভাব। একটা সংবাদে দেখছি— প্রধানমন্ত্রীর নিষেধ সত্ত্বেও মন্ত্রীদের মধ্যে বিদেশ ভ্রমণের তাগিদ বেশ বেড়ে গিয়েছে।

হিসেবে দেখা যাচ্ছে— গত দুই বছরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের বিদেশ-যাত্রার সংখ্যা ৭৫১। তাঁরা মোট তিন হাজার দিন বিদেশে থেকেছেন। মোট ৪০ জন মন্ত্রীর তরফে বিদেশ যাত্রার জন্য ৭৭৭টা আবেদন-পত্র জমা পড়েছিল, তার মধ্যে ২৬টা ফেরত পাঠানো হয়েছে। তাতেই বিদেশ ভ্রমণের জন্য খরচ হয়েছে প্রচুর টাকা— অন্তত ২৬০টা বিদেশ যাত্রার জন্য খরচ হয়েছে ১২ কোটি টাকারও বেশি। এর মধ্যে বিদেশমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণা ১৩৮ বার বিদেশে গিয়েছেন— থেকেছেন মোট ১৭৮ দিন। বিদেশমন্ত্রীর বিদেশে যাওয়ার দরকার থাকতেই পারে, কিন্তু অন্যদেরও কি বারবার বিদেশে যাওয়ার দরকার ছিল? অনেক ক্ষেত্রে বিদেশ-ভ্রমণের বিষয়ে কিছু তথ্য দেওয়া হলেও খবরের ব্যাপারে বিস্তারিত হিসেব দেওয়া হয়নি। মনে হয়, জনগণের কষ্টের টাকা এভাবে খরচের ব্যাপারে অনেক মন্ত্রীরই দ্বিধা দেখা দেয়নি। এটা গণতন্ত্রের মুখ্যতন্ত্রে রূপান্তরের একটা ঝোঁককে প্রকট করে তুলেছে।

পঞ্চমত, রয়েছে কালো টাকার সমস্যা। এটাও মুখ্যতন্ত্রের একটা লক্ষণ। ১৯৪৮ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত নাকি দেশ থেকে গোপনে পাচার হয়েছে ২৫ লক্ষ কোটি টাকা। ২০০৯ সালের মধ্যেই যদি মোট কালো টাকার পরিমাণ থেকে থাকে ১০০, তাহলে ভারতেরই রয়েছে ৫৪.২ টাকা। এর পেছনে আছেন ধনীরা।

'গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি'-র রিপোর্ট অনুসারে ভারতের কালো টাকার পরিমাণ হলো ৬৪ হাজার কোটি ডলার— অর্থাৎ ৩২ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে ১৭৮০০ কোটি ডলার রয়েছে দেশের ভেতরেই, বাকিটা বিদেশী ব্যাঙ্কে। শতবার দাবি জানালেও সরকার এই ব্যাপারে কোনও তথ্য জানায়নি। অথচ এটা উদ্ধার করা গেলে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করা যেত, আগামী দশ বছর উন্নয়নের জন্য কর বসাতে হোত না এবং বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ে ভারত এশিয়ার এক নম্বরে থাকত।

কিন্তু সেটা হয়নি কেন, সেই কথা বোঝার জন্য কষ্ট করতে হয় না।

পরিশেষে বলি, আরও একটা সমস্যা আছে— সেটা হলো মুখ্যতন্ত্রের (মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত শাসনতন্ত্র) মূর্খতন্ত্র হয়ে ওঠার ঝোঁক। আগে কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতা গুণ্ডাদের সাহায্যে কর্তৃত্ব করার চেষ্টা করত, এখন কিছু গুণ্ডা নেতা হওয়ার উদ্যোগ নিয়ে থাকে। তাই এখন নির্বাচনী রাজনীতি ব্যালটের বদলে বুলেট নির্ভর হতে চলেছে। সংবাদপত্রে দেখলাম, পাঁচটা রাজ্যে নির্বাচন আসন্ন হয়ে ওঠায় বেশ কিছু দাগী অপরাধী নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে প্রার্থী হিসেবে।

এই ব্যাপারে জনমত জাগ্রত হয়েছে অবশ্যই। বিশেষ করে, নির্বাচন কমিশনও এটাকে রোধ করতে চাইছে। এই কারণে বড় দলগুলো দাগীদের মনোনয়ন দিতে চাইছে না। তার ফলে অন্তত উত্তরপ্রদেশের কিছু ছোট দল বেশ কিছু দাগীকে মনোনয়ন দিয়েছে। 'রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন' দল, 'পিস্ পার্টি' প্রভৃতি খুচরো দল মনে করে যে, এটা কোনও আপত্তিকর ব্যাপারই নয়।

বহু আগেই আমাদের নির্বাচনী রাজনীতিতে গুণ্ডামীর আমদানি হয়েছে। বুথ দখল, ভীতিপ্রদর্শন, ব্যালট-ছিনতাই, বোমাবাজি, বিপক্ষের এজেন্ট-বিতাড়ন প্রভৃতি জিনিস বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি রাজ্যের নির্বাচনকে বারবার কলুষিত করেছে বলে ডাঃ অনুপচাঁদ কাপুর মনে করেন। তাঁর ভাষায়— ...'even the dacoits are wooed by politicians for support at the polls'— (দ্য ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেম, পৃঃ ৪২৫)। এই কারণে অনেক সময় নির্বাচন একটা দামী প্রহসনে পরিণত হয়। এস এন সিক্রি লিখেছেন, অনেক ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তিরা ভোট দেন— জীবিতরা সেই সুযোগ পান না— 'Thousands of voters long dead and countless of others who never casted vote regularly'—(ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃঃ ১০১)।

এই সব কারণে প্রশ্ন উঠেছে—ভারতীয় গণতন্ত্র কি সত্যিই গণতন্ত্র?

পাকিস্তানকে ভারতের ডিজেল ও বিদ্যুৎ

মুমূর্ষুকে অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে

অতিথি কলম

মুজফফর হোসেন

সম্প্রতি ভারত সরকার আমাদের দেশের শাক-সবজি এবং লঙ্কা-মশলা পাকিস্তানে রপ্তানী করতে শুরু করে দিয়েছে। তবে ভারত থেকে পাকিস্তানে রপ্তানীকৃত পণ্যের তালিকায় সবার উপরে 'লঙ্কা'ই। কেননা, ভারতের লঙ্কা পাকিস্তানীদের কাছে খুবই পছন্দের। পাকিস্তানে গত দু'বছরই বেশ ভালোমতো বন্যা হয়েছে। যার ফলে যে সকল ক্ষেতে সবুজ শাক-সবজির চাষ ছিল— সে সবই চৌপাট হয়ে গিয়েছে। এজন্য বাজারে সবজি প্রায় অমিল। টমেটো বা ফুলকপি প্রায় অদৃশ্য।

পাকিস্তানীরা ঢেঁড়স আর তরুই সবজি দারুণ পছন্দ করে। কিন্তু তা পাক-বাজারে অমিল। বিদেশে (ভারত বাদে) এর দাম অনেক বেশি আর দূরবর্তী দেশ থেকে আমদানি করতে খরচও বেশিই পড়ে। এখন পাকিস্তানে দিনে-রাতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে। পাকিস্তানের আম-জনতার কাছে নিত্য ভোজ্য সামগ্রীই নেই। সেজন্য তাদের পক্ষে ভারত থেকে আমদানি করা ছাড়া অন্য বিকল্প পথ খোলা নেই। ভারত থেকে বাঘা বর্ডার দিয়ে সবজিভর্তি ট্রাক নিয়মিত পাকিস্তানে যেতে দেখা যাচ্ছে। ভারতকে পাকিস্তান সর্বাধিক পছন্দের দেশের তালিকায় রাখেনি, আবার নিত্য-নিয়মিত বাণিজ্যের ব্যাপারেও বিশেষ আগ্রহী নয়। তা সত্ত্বেও ভারতীয় সবজি পাকিস্তানে যাচ্ছে আর এর দুষ্পরিণাম হবে ভারতে। ভারতে সবজির দাম বাড়তে থাকবে। যে সবজির দাম এখনই চড়া তার দাম আরও বাড়বে। পাকিস্তান ভারতীয় সবজি কিনলেও 'পান' কিনছে শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশ থেকে। একটা সময় ছিল যখন ভারতীয় পান-এর একচেটিয়া বাজার ছিল পাকিস্তান। এখনও ভারতের মঘাই, বাংলা-পান, বেনারসী পান ও মালবীয় পানের চাহিদা রয়েছে। পেঁয়াজ নিয়ে তো কতই না ছেলেখেলা হয়। পাকিস্তান প্রতিবছরই ভারত থেকে পেঁয়াজ কেনে। কিন্তু তারা চাহিদার তুলনায় বেশি কিনে কোল্ডস্টোরে জমা রাখে। তারপর ভারতে কম পড়লেই সেই পেঁয়াজ দ্বিগুণ তিনগুণ দামে ভারতকে বিক্রি করে। পাকিস্তানের প্রতি ভারত সরকারের দাক্ষিণ্যের তুলনা নেই। ফলে দেশের ক্ষতি করেও প্রতিবেশী দেশের সেবা করা হয়।

ভারতের দিলদরিয়া ব্যবহার

এত সেবা করেও ভারত সরকারের মন ভরেনি। সেজন্য এবার বহুমূল্য বিদেশী মুদ্রা দিয়ে কেনা ডিজেল এবং বিদ্যুৎ পাকিস্তানকে উপঢৌকন দিতে চলেছে। এর জন্য যুক্তি দেওয়া হচ্ছে যে আমাদের প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। ফলে কিছু-না-কিছু করতে তো হবেই। সেজন্য যদি দেশের মানুষ না খেতে পায়, দাম বাড়ে সেও সই— পাকিস্তানের যেন কষ্ট না হয়! ভারত সরকারের যুক্তি কতটা মেঠো তা নিয়ে যত কম বলা যায় ততই ভালো। পাকিস্তানের প্রেমে বিভোর ভারত সরকার। স্তম্ভিত করার মতো খবর হলো— ভারত সরকার পাকিস্তানকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দিতে চলেছে। সেই বিদ্যুৎ অমৃতসর হয়ে লাহোর পৌঁছাবে। এটা তো কিছুই নয়। ভারত সরকারের আরও একটি সিদ্ধান্ত হতবাক করে দেওয়ার মতো। ২০০ কিমি পাইপলাইন বসিয়ে পাকিস্তানকে বহুমূল্য ডিজেল সরবরাহ করা নিশ্চিত হয়েছে বলে জানা গেছে। আমাদের দেশের ডিজেল-পেট্রলের অবস্থা কি তা পৃথিবীসুদ্ধ লোক জানে। প্রচুর বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে বিদেশ থেকে এসব কিনতে হয়। ডিজেল-পেট্রলের দাম দিন দিন বাড়ছে। রান্নার গ্যাসের কথা তো বলার নয়। কিন্তু সরকারের নিজ দেশের নাগরিকদের নিয়ে চিন্তা নেই। দিলদরিয়া হয়ে পাকিস্তানের চরণসেবা করতে সদা-তৎপর। আমাদের কেনা অপরিশোধিত তেল থেকে তৈরি ডিজেল পাকিস্তানে পাঠানো হবে। সরকারের বক্তব্য— আমাদের নিজস্ব রিফাইনারি থেকে তৈরি করা বলে লাভ হবে। কিন্তু এটা আর্থিক লাভ-ক্ষতির প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন দেশের নিরাপত্তার। যদি ওই ডিজেল পাক-ভারত সীমান্তে পাকিস্তানী সেনাদের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহলে কি আমাদের জাতীয় স্বার্থে তা লাভজনক? ভারতের যদি আর্থিক লাভ হয়ও, তাহলেও কি তা শত্রু দেশের পক্ষে বর-প্রাপ্ত হওয়ার সামিল নয়? তাহলে তো ভারতীয় অস্ত্র-শস্ত্রও আর্থিক লাভের জন্য পাকিস্তানকে বিক্রি করতে হয়, আর সেই অস্ত্র পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যতই ব্যবহার করুক না কেন। তখন হয়তো বলা হবে অস্ত্র বিক্রি করে বিদেশী মুদ্রা পাওয়া গেছে। কতটা দুঃখ, আফসোসের কথা— যে পাকিস্তান প্রতিদিন ভারতে সন্ত্রাসবাদী পাঠাচ্ছে, দাউদ-এর মতো ভারতবিরোধী সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দিচ্ছে, সেই পাকিস্তানকেই সবজি, ডিজেল, বিদ্যুৎ দেবে ভারত! পাকিস্তান তো দিন দিন ভারতের ক্ষতি করার মতলব আঁটছে, ক্ষতি করছে। ভারতে লোডশেডিং-এ অন্ধকার হোক, কিন্তু পাকিস্তানে আলো জ্বলতে থাকুক। পাকিস্তান ভালো করে বিচার-বিবেচনা করে স্থির করে ফেলুক ভারতের কোথায় হামলা করবে! রিফাইনারি লাভে চালানোর জন্য পাকিস্তান বাদে অন্য দেশকেও তো ডিজেল বেচা যেতে পারে। পাকিস্তানের মতো নেপাল, ভূটানও কাছের প্রতিবেশী দেশ, এখানে দূর বা কাছের প্রশ্ন নয়— বেচাকেনার ব্যাপারে বাণিজ্যচুক্তি হতেই পারে।

সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা কী?

ভারত সরকারের আর এক দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত হলো— স্বর্ণমন্দিরের পবিত্র শহর অমৃতসর দিয়ে পাকিস্তানের লাহোরে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাঠানো। ভারত সরকার হয়তো-বা চান যাতে বাঘা সীমান্তের পারে পাক সেনাদের কাছে ভারতভূমি পরিষ্কার দেখা যায়। যাতে পাক-সেনাদের হামলা করতে

সুবিধা হয়। ভারতের অন্যান্য শহরে মুম্বাইয়ের পুনরাবৃত্তি হলে আর অসুবিধা কি? প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক— ভারত কি কোনও চাপে পড়ে এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছে? ভারতের বাধ্যবাধকতাটা কোথায়?

পাকিস্তানের সংবাদপত্রে যে সকল খবর বের হয়েছে তাতে স্পষ্ট যে খিচুড়ি ভালোমতোই রান্না হচ্ছে। তবে এতটা জলভাত নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না বিদেশমন্ত্রক ও প্রতিরক্ষামন্ত্রক সবুজ সঙ্কেত দিচ্ছে ততক্ষণ ওই প্রকল্পকে কার্যকর করা যাবে না। মাত্র ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ লাহোর-এ সরবরাহ করা, ভাতিণ্ডার রিফাইনারিতে এত বেশি পরিমাণে ডিজেল আছে যে তা পাকিস্তানে পাঠাতে ২০০ কিমি পাইপ লাইন তৈরিতেও ভারত পেছপা নয়। সরকারের এই পদক্ষেপ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতি করার জন্য। মনোভাব এই যে, প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরিতে কিছু তো ত্যাগ করতে হবে। আর এজন্যই কি ভারত সরকার এই দামী জিনিসগুলোকে বিসর্জন দিয়ে একটি সন্ত্রাসবাদী দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ উন্নত করে ভালো ব্যবহারের প্রত্যাশা করছে? এই পরিপ্রেক্ষিতে এটাই বলা যেতে পারে যে, সরকার এর দ্বারা 'ভস্মাসুর'-কে আশীর্বাদ প্রদান করতে চলেছেন। লেনদেন-এর নীতির ভিত্তিতে ভারত কেন একসময়ে পাকিস্তানকে বলছে না যে, ইরানের সঙ্গে আমাদের গ্যাস-চুক্তি হয়েছে। সেই গ্যাস ভারতে আনার জন্য পাকিস্তান ভারতকে তাদের দেশের ভিতর দিয়ে পাইপ লাইন বসানোর জন্য স্বীকৃতি কেন দিচ্ছে না? পাকিস্তানে ভারতের সব ব্যাপারে বাগড়া দেয়। ভারত সেই পাকিস্তানকে মুখের কথা খসানোর আগেই সবকিছু দিতে তৎপর। ইরান থেকে গ্যাস পেলে আমাদের খনিজ তেলের উপর নির্ভরতা কম হোত। এখনও সময় আছে। ভারত সরকার চাইলে পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করে ইরান থেকে গ্যাস আনতে পাইপ লাইন বসানোর স্বীকৃতি আদায় করতে পারে। ইরান থেকে পাকিস্তানের উপর দিয়েই ভারতে গ্যাস আসতে পারে। পাকিস্তান আমাদের কোনও কথাই আমল দেয় না আর আমরা পাকিস্তানের জন্য দিলদরিয়া!

পাকিস্তানে এসময় বিদ্যুৎ সংকট কতটা তীব্র তা নিয়ে পাকিস্তানী দৈনিক 'দ্য নেশন' সম্পাদকীয় লিখেছে। তার কিছুটা পড়ে দেখলে বিষয়টা অনেকটা বোঝা যাবে। পত্রিকাটি লিখেছে— শত্রু যখন ধরাশায়ী তখন তাকে প্রাণবায়ু দেওয়া ঠিক নয়।...অর্থমন্ত্রী আব্দুল আজিজ শেখের নেতৃত্বাধীন 'ইকনোমিক কো-অর্ডিনেশন কমিটি' আফগানিস্তানে পেট্রল রপ্তানীর উপরে স্থগিতাদেশ দিয়েছে। সি এন জি কিটও গাড়ীতে ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। কমিটির বক্তব্য, তাদের দেশে তেল-গ্যাসের সংকট ও স্বল্পতার জন্যই এই সিদ্ধান্ত।"

পাকিস্তানী পত্রিকাটি আরও বলেছে— আমাদের তেল সঙ্কটের অন্যতম প্রমাণ হলো, আমাদের কাছে রেলগাড়ি চালানোর মতোও জ্বালানি নেই। রেল যদি সময়মতো না চলাচল করে তাহলে সাধারণ মানুষের কত কষ্ট হয়! এটা সরকারের বোঝার বাইরে। এর সঙ্গে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশন্যাল এয়ারলাইন্স সঙ্কট আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। পাকিস্তান পীপলস পার্টি চার বছর যাবৎ ক্ষমতায় রয়েছে। কিন্তু দেশে অন্ধকার আর যাতায়াত ব্যবস্থা পঙ্গু।" এই অবস্থায় ভারত কেন বুঝতে পারছে না যে, শত্রু যখন অন্তিম শ্বাস নিচ্ছে তখন তাকে কেন অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ করা হবে?

উত্তর-পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নতুন আলোর দিশারী

সংস্কার ভারতী ভিশন - ২০20 আয়োজিত ‘বাল কলা সঙ্গম’

হরিমোহন দাস

সবুজ বনস্পতিতে ভরা ছোট ছোট পাহাড়ের পাশ দিয়ে অসংখ্য বাস বহু কচি-কাঁচাদের কোলাহলকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এই বাসগুলির কোনও কোনওটার সামনে লেখা আছে— ‘‘বাল কলা সঙ্গম’’- নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর, ত্রিপুরা, সিকিম ইত্যাদি। এই বাসগুলির সম্মিলিত গন্তব্যস্থল অসমের কামরূপ মেট্রো জেলার মধ্যে অবস্থিত ‘সরোসোজাই স্টেডিয়াম’। যেখানে গত ২৯ ডিসেম্বর থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অখিল ভারতীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘সংস্কার ভারতী পূর্বোত্তর ভিশন ২০২০’-এর আয়োজনে সম্পন্ন হলো ‘বাল কলা সঙ্গম ২০১১’। যার মূল স্লোগান ছিল ‘‘দেশ কা ভবিষ্য বাচ্চো কে হাত, বাচ্চো কে সাথ।’’ আক্ষরিক অর্থেই এই বাল কলা সঙ্গমে ইতিহাস সৃষ্টি করল অসমসহ উত্তর-পূর্ব ভারতের আট রাজ্যের ৮ থেকে ১৫ বছরের ১১০০ জন ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, যারা কিনা ১১০০ মিটার ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলল ‘আমাদের সংস্কৃতি আমাদের পরিচয়’-এর নানা চিত্র, সৃষ্টি হলো উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা ভারতের অন্যতম বৃহৎ অঙ্কনশিল্পের ইতিহাস।

সংস্কার ভারতী বিশ্বাস করে পূর্বোত্তর ভারতের কলা-সংস্কৃতির যে গভীরতা আছে তার মাধ্যমেই এই অঞ্চলের দীর্ঘ দিনের প্রবহমান সন্ত্রাসবাদ, হিংসা, নানান বিভেদমূলক কর্মকাণ্ড তথা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবের পরিবেশকে বিনষ্ট করা যেতে পারে। আর সংস্কার ভারতীর এই চিন্তাধারার সঙ্গে সহমত পোষণ করে প্রথমেই এগিয়ে আসেন সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর। সেইসঙ্গে পণ্ডিত যশরাজ এবং সর্বপ্রথম শুভেচ্ছা পত্র পাঠিয়ে কার্যকর্তাদের মনোবলকে মজবুত করে ভারতের বিজ্ঞানতপস্বী ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালাম।

সমগ্র অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে প্রথম থেকেই পা বাড়িয়েছিলেন চলচ্চিত্র অভিনেতা থেকে সঙ্গীতজ্ঞ, প্রশাসক, বিচারপতিসহ বিশিষ্ট সমাজসেবী পর্যন্ত। কিন্তু অসমীয়া তথা ভারতীয় সঙ্গীত জগতের সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজারিকা না থেকেও সবার মধ্যে বিরাজিত ছিলেন তাঁর গানের সুরের ধ্বনিতে, তাঁর বিশাল মূর্তির মধ্যে দিয়ে। তাই তাঁরই মূর্তির সামনে বসে সংস্কার ভারতীর ধ্যেয় গীত ‘সাধয়তি সংস্কার ভারতী’ পরিবেশিত হবার পর শ্রদ্ধেয় ভূপেন হাজারিকার মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওড়িশা হাইকোর্ট তথা সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এস এন ফুকন সহ অসমীয়া চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তির তথা ‘বাল কলা সঙ্গমে’র কার্যকারী সভাপতি প্রাঞ্জল সাইকিয়া, শ্রদ্ধেয় বাবা যোগেন্দ্রজী, আর এস এসের প্রবীণ প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ মোতলগ এবং সংস্কার ভারতী উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সভাপতি বিমল লাঠ। আর উত্তর-পূর্ব ভারতের ৫৩ জেলা থেকে আসা বাছাই করা ১৩০৪ জন শিশু কলাকুশলী ও তার সঙ্গে অভিভাবক, প্রবন্ধক প্রমুখ কার্যকর্তা মিলিয়ে ৬০৪ জন, যা বাস্তবিকই ‘বাল কলা সঙ্গম’কে বাল কলা সাগরে পরিণত করেছিল। এই সাগরসঙ্গমেই উদ্ভাসিত হচ্ছিল প্রখ্যাত সাহিত্যিক মামণি গোস্বামী দিদির ছবি।

বাল সঙ্গমের মঞ্চে হেমামালিনী।

ব্রহ্মপুত্র নদীর জলের মতো পবিত্র এই আট রাজ্যের শিশু কলাকুশলীদের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, রংবেরঙের পোষাক, ভিন্ন ভিন্ন নৃত্য শৈলী দেখে মনে হচ্ছিল ভগবান যদি বয়সটা কমিয়ে ওদের মতোই করে দিতেন অথবা সেই বিখ্যাত বাংলা ছবি ‘আশি’তে আসিও না’র মতো যদি একটা পুকুর থাকত যেখানে ডুব দিয়ে ছোট্ট ছেলে হয়ে আসা যেত! কিন্তু যাই ভাবি না কেন কবির ভাবনাই সার্থক— ‘বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান’।

বছরভর ধরে চলে আসা বিভিন্ন কর্মশালায় উত্তীর্ণ হওয়া শিশু কলাকুশলীদের দ্বারা তিন দিন ধরে পরিবেশিত হয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির বিভিন্ন স্বরূপ— যেখানে ছিল অসমের ভারত বিখ্যাত বিহু, ঝুমুর, তিওবা, অরুণাচলের সালো, মেঘালয়ের শাদলিংগ, শাদসুকমাইচিয়াম, মণিপুরের খাম্বা খৈবীর মতো লোকনৃত্য। শাস্ত্রীয় নৃত্যে অরুণাচলের কথকের পাশাপাশি প্রাণ ভরিয়েছে মণিপুরী মহারাস। এছাড়া কবিতা, নাটক, বন্দেমাতরম নৃত্য, গান বাজনা ও ভূপেন হাজারিকার সেই অসমীয় ভাষায় বিখ্যাত গান ‘মানুহে মানুহর বাবে’, (যা

বাংলার ঘরে ঘরে আগে থেকেই সঞ্চিত হয়ে আছে 'মানুষ মানুষেরই জন্য') এবং সামঞ্জস্য বিধান করে গাওয়া 'মনুষ্য তু বড়া মহান 'হ্যায়'-এর মতো কালজয়ী গান। তিন দিন ধরে চলে আসা 'বাল কলা সঙ্গমে'র স্বাদ নিতে প্রথম দিনেই এসেছিলেন ভজন সম্রাট অনুপ জালোটা, ওঁর সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে ছিল দেশপ্রেমের মন্ত্র। ভজন, গজলকে, ভগবানকে কাছে পাওয়ার মাধ্যম বলে তিনি বর্ণনা করেন। দম বাড়ানোর জন্য ছোট বয়স থেকেই প্রাণায়াম করতে পরামর্শ দেন।

আদর্শ নাগরিক এর মতোই দ্বিতীয় দিনে উপস্থিত হয়েছিলেন মেঘালয়ের রাজ্যপাল রঞ্জিৎ শেখর মুসাহরী। তিনি শিশুদের চিত্রাঙ্কন দেখলেন। তাদের প্রশংসা করলেন, উদ্যোক্তাদের দিলেন পরামর্শ আর শিশুদের বলে গেলেন— তোমাদের হাতেই ভারতের ভবিষ্যত, তাই তোমরা এখন থেকে এই সঙ্গমে শপথ নাও যে জীবনে কখনও দুর্নীতিগ্রস্ত হবে না। দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় ভাগে এলেন ওস্তাদ বসিফুদ্দিন ডাগর, শিশুদের তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভারতীয় সঙ্গীতে 'রাগ' ও তার মহত্ত্ব বর্ণনা করলেন এবং অনুশীলন করালেন শিব স্তোত্রম। অখণ্ড ভারতের মন্ত্র দিয়ে শিশুদের তিনি শেখালেন ও বলালেন যে, 'তোমরা প্রথমে অসমবাসী, মণিপুরবাসী না বলে প্রথমে বল আমি পূর্বোত্তরবাসী, আমি ভারতবাসী'।

তৃতীয় দিনে এলেন, ত্রিনয়নী দুর্গার বেশে যাঁকে নৃত্য করতে আমরা দেখেছি সেই চির জনপ্রিয় অভিনেত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ হেমামালিনী। আসলে সঙ্গমের মঞ্চে আট রাজ্যের ছোট-ছোট-ছেলে-মেয়েদের উপস্থিতি হেমামালিনীর মনকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তারপর তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন মণিপুরী শিশুদের শাস্ত্রীয় নৃত্য 'মহারাস' ও অসমের ভারত বিখ্যাত 'বিহু নৃত্য' দেখে। পরে নৃত্য প্রস্তুতকারী সকলকে মঞ্চে ডেকে তিনি আশীর্বাদ করলেন এবং শোনলেন সুন্দর হওয়ার গোপন কথা, আর সকলকে অবাক করে দিয়ে পূর্বোত্তরের শিশু শিল্পীদের আগামী সেপ্টেম্বর মাসে মুম্বই যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন। দ্বিতীয় ভাগে এলেন ছোটদের অতি প্রিয় শক্তিমান খ্যাত মুকেশ খান্না, যিনি এলেন, দেখলেন ও জয় করলেন এবং সেই সঙ্গে জিতে নিলেন সকল শিশুর হৃদয়। সব রাজ্যের বাচ্চাদের সঙ্গে আলাদা আলাদা ছবি তুললেন। স্বহস্তে শিশুদেরকে অটোগ্রাফ দিলেন এবং বললেন উত্তর-পূর্বের শিশুরা তোমরা সংযম ও সাহসকে অবলম্বন করে এগিয়ে যাও। আমি শক্তিমান সব সময়ই তোমাদের সঙ্গে আছি, ভবিষ্যতেও থাকব।

শেষ হয়েও হইল না শেষ প্রবাদ বাক্যের মতোই বাবা সত্যনারায়ণ মরিয়ার কার্যক্রম চলল— নৃত্য, সঙ্গীত, চিত্র এই ত্রিবিধ ধারার মধ্যে দিয়ে তিনি ভারত মায়ের আরতি করলেন। আদি শঙ্করাচার্য থেকে ভারত মায়ের ছবি আঁকতে আঁকতে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশনেরই ফাঁকে ফাঁকেই তাঁর চয়ন করা শব্দের মাধ্যমে ভারতীয় নববর্ষ, ভারতীয় সঙ্গীত, ভারতের বৈচিত্র্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেন বহু ভাষাভাষী এসেছি আমরা সকলে, কিন্তু মা আমাদের একজনই, তিনি ভারতমাতা। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পরমপূজনীয় সরসঙ্ঘচালক মোহন রাও ভাগবতের কথাকে পুনঃস্মরণ করে গানের সুরে মিলিয়ে দিয়ে সকলকে গাওয়ালেন। তিন দিনের এই বাল কলা সঙ্গমে সঙ্গীত চেতনা থেকে সংস্কৃতি চেতনা, গোষ্ঠী চেতনা থেকে রাষ্ট্রচেতনা সব মিলে মিশে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। আসলে মা কামাখ্যা এটাই চেয়েছিলেন। তাঁরই আশীর্বাদে সার্থক হলো বাল কলা সঙ্গম।

সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের আলোকে উদ্ভাসিত

সংস্কার ভারতী'র 'ভিশন ২০২০'

অর্ণব নাগ

সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থানে নিঃসন্দেহে এ এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের যে ধ্যান-ধারণার সঙ্গে আমরা সুপরিচিত সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের ব্যাপ্তি তার থেকে অনেক বিশাল। ভারতবর্ষ মানে তো উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে কেরল-তামিলনাড়ু, পশ্চিমে গুজরাট থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের গোটা আষ্টেক রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত সামান্য একটা ভূখণ্ড নয়। কিংবা পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কা-কে নিয়ে অখণ্ড ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করলেও জননী

সংস্কর ভারতীর 'ভিশন - ২০২০'।

ভারতবর্ষকে সঠিক অর্থে বোধহয় আমরা অনুধাবন করতে পারব না। দেশের শেষ শিলাখণ্ডে বসে বিশ্ববন্দিত ভারত-পথিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ তিনদিন তিন রাত যে ভারতবর্ষের ধ্যান করেছিলেন তা আক্ষরিক অর্থেই ছিল, 'হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী, গান্ধার থেকে ব্রহ্মদেশ; 'সেই তো মোদের ধ্যানের ভারত, সেই তো মোদের পুণ্যদেশ'-এর ভারতবর্ষ, তথা হাজার হাজার বছরের সুমহান সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিন্দুস্থান। সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের মহত্ত্ব এখানেই। যা জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ভৌগোলিক সঙ্কীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে একই সংস্কৃতির সুবিশাল পরিমণ্ডলে ব্যাপ্ত করে দেয়।

ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে প্রবহমান সেই সাংস্কৃতিক ধারার নামই হিন্দু সংস্কৃতি। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের যে ঐতিহ্য আমাদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য তা সযত্নে রক্ষিত হচ্ছে উত্তর-পূর্ব ভারতের আটটি রাজ্যে যথা অসম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, মিজোরাম এবং সিকিম-এ। অথচ এই রাজ্যগুলিই আজ বিচ্ছিন্নতাবাদ, নাশকতা, অরাজকতার শিকার। সেইসঙ্গে বাকি দেশের উন্নাসিক মানসিকতা আর এখানকার মানুষের প্রতি অবহেলা ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মানুষের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে অনেকাংশে ব্যাহত করেছিল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও তার সমমনোভাবাপন্ন সংগঠনগুলো বিশেষ করে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের মতো সংগঠনসমূহ নব্বই-এর দশকের গোড়া থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তাদের

বাল সঙ্গমের মঞ্চে কচিকাঁচাদের সঙ্গে মুকেশ খান্না।

কাজ বৃদ্ধি করায় মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদী মানসিকতা ফের গড়ে উঠতে শুরু করেছে। তবে এসবের মধ্যেও উত্তর-পূর্বের ভারতবাসীর মনে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থানের প্রয়োজনীয়তা ইদানীং অস্থির সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বড় বেশি অনুভূত হচ্ছিল।

আর এই প্রেক্ষিতেই ২০০৬ সালে ভারতীয় সংস্কৃতি জগতে স্বীয় স্বকীয়তায় বিশিষ্ট স্থান করে নেওয়া সংস্কার ভারতীর উদ্যোগে ২০০৬ সালেই 'ভিশন ২০১০' প্রকল্প গৃহীত হয়েছিল যার মূল লক্ষ্য ছিল সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তারই সময়সীমা বেড়ে 'ভিশন ২০২০' প্রকল্প নেওয়া হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতে সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, অঙ্কন এবং ভাস্কর্য ইত্যাদি শিল্পকলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে নিজস্ব ঘরানা ও স্বতন্ত্র আঙ্গিক রয়েছে তা সংরক্ষণ এবং প্রতিপালনের জন্য এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছে। 'আমাদের উত্তর-পূর্ব' স্লোগানকে সামনে রেখে নিম্নলিখিত উদ্যোগগুলো নেওয়া হয়েছে :

(১) শিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য এবং তাদের প্রস্তুতিপর্বের (রিহার্সালের) জন্য গ্রাম স্তরে সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলির উন্নয়ন।

(২) উত্তর-পূর্বের আটটি রাজ্যে আভ্যন্তরীণ শিল্পী বিনিময়ের জন্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।

(৩) সারা ভারতেও একইভাবে সাংস্কৃতিক বিনিময়ে গুরুত্ব।

(৪) দেশাত্মবোধক এবং আধ্যাত্মিক থিমের ওপর অনুষ্ঠানে প্রাধান্য।

(৫) দেশের অন্যান্য রাজ্যের কলা-প্রেমী মানুষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ভ্রমণের জন্য বিশেষ ভ্রমণ-পরিকল্পনা।

(৬) প্রদর্শনী, আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে পাওয়ার-পয়েন্ট উপস্থাপনা এবং দর্শন-শ্রবণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যগত সমৃদ্ধিকে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা।

(৭) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জননায়ক, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, পণ্ডিতব্যক্তিবর্গ এবং সাধু-সন্তদের দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও সুপরিচিত করে তুলতে সাহিত্য প্রকাশে জোর দেওয়া।

(৮) যোগাযোগের খামতি পোষাতে সম্পর্ক তৈরি, উত্তর-পূর্বে প্রতিষ্ঠিত শিল্পী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান-প্রদর্শনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

(৯) গ্রাম ও জেলা স্তরে শিল্পকলার প্রতিটি স্তরে নবীন শিল্পীদের উপযুক্ত মঞ্চ-প্রদানে জোর দেওয়া হয়েছে।

(১০) স্কুল স্তরে কিশোর এবং সম্ভাবনাময় শিল্পীদের কাছে পৌঁছোতে কর্মক্ষম শিক্ষা-কেন্দ্রগুলিকে সরাসরি এব্যাপারে যুক্ত এবং শিল্পকলার প্রতি আগ্রহী শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা রয়েছে।

(১১) কলেজ ছাত্রদের মধ্যে থেকে প্রতিভার অন্বেষণ এবং তাদের প্রয়োজনীয় মঞ্চ প্রদানে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ নির্বাচন ও শ্যামাপ্রসাদের অতীত সাবধানবাণী

শিবাজী গুপ্ত

ঘটনাচক্রে ৬৬ বছর পরে হিন্দুরা সেই একই পরিস্থিতির সম্মুখীন। সেদিন শ্যামাপ্রসাদ যে সাবধান বাণী শুনিয়েছেন তার প্রাসঙ্গিকতা চতুর্গুণ সত্য হয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে। তৎকালীন ভোটারদের কাছে প্রেরিত শ্যামাপ্রসাদের আবেদন পত্রের এক কপি আমাদের হস্তগত হয়েছে। সাম্প্রতিক পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন এবং আড়াই বছর পর সাধারণ নির্বাচনের প্রেক্ষিতে সেই আবেদনপত্র 'স্বস্তিকা'র পাঠকদের জ্ঞাতার্থে হুবহু পুনর্মুদ্রিত হলো :

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আবেদন

কেন্দ্রীয় পরিষদে চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের নির্ব্বাচনে হিন্দু মহাসভার মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরীকে ভোট দিতে ভুলিবেন না।

বন্ধুবরেষু,

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের আসন্ন নির্ব্বাচনে হিন্দু মহাসভার মনোনীত প্রার্থীকে আপনি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিবেন, এই অনুরোধ লইয়া আজ আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইতেছি। হিন্দু মহাসভা কেন নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে, তাহা আমার ও হিন্দু সভার অন্যান্য নেতার বিবৃতি হইতে আপনি নিশ্চয়ই জানিতে পারিয়াছেন। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র যে সকল আইনসভা ও শাসনযন্ত্র প্রচলিত রহিয়াছে সেগুলি যে হিন্দুদের স্বত্ব ও অধিকার ধ্বংস করিবার জন্য নিয়োজিত, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। হিন্দুদিগের রাজনৈতিক অধিকার নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের সৃষ্টি, উহাকেই ভিত্তি করিয়া বর্তমান আইন সভাগুলি সৃষ্ট হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত যে কেবল হিন্দুদিগকেই বিপন্ন করিয়াছে তাহা নহে; ইহা ভারতের স্বাধীনতা ও জাতীয়তার পথেও সঙ্কট উপস্থিত করিয়াছে। এই বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইলে আইনসভায় এমন লোক নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠাইতে হইবে যাহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করিবে না, অপরের অনুগ্রহ অথবা নিগ্রহের প্রতি দৃকপাত না করিয়া হিন্দু জাতির ন্যায্য অধিকার রক্ষার জন্য এবং সেই সঙ্গে ভারতের অখণ্ডত্ব ও স্বাধীনতার জন্যও সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত থাকিবে। হিন্দুরা অতীতে এই প্রকারের লোককে নির্ব্বাচিত না করায় মারাত্মক কুফল ফলিয়াছে। আমরা আবার সেই ভুল করিলে, ভবিষ্যতে হিন্দু জাতিকে ধ্বংস হইতে বাঁচাইবার কোন উপায় থাকিবে না।

দেশের সম্মুখে এখন যে সকল গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত, ভারতব্যবচ্ছেদের প্রস্তাব তাহাদের অন্যতম। যে যে প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যায় মুসলমান অপেক্ষা কম, সেই সেই প্রদেশ (অর্থাৎ

১৯৪৬ সালে বৃটিশ শাসনে শেষ নির্বাচনে হিন্দু মুসলমান ধর্মের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত আলাদা ভোট দিয়ে ভারত খণ্ডিত হবে কি অখণ্ড থাকবে সে প্রশ্নে মত দান করে। যথারীতি মুসলমানরা শতকরা ৯৮ জনই ভারত ভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে ভোট দেয়। সে সময় কংগ্রেসের ভেড়ুয়া নেতারা সদর্পে বলতে পারেনি— তোমরা মুসলমানরা ভারতে অনধিকার প্রবেশকারী, এদেশের ভাগ্য নির্ধারণে তোমাদের কোনও এক্তিয়ার নেই। ভারতের ভাগ্য নির্ধারণ করবে হিন্দুরা। তাদের দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে ভারতমাতার দেহ খণ্ডিত করার সাহস কোন্ শা-র হয় দেখ নেবো।

কিন্তু ছাগ-দুগ্ধপুষ্ট জাতির জনকের মুখে সিংহ গর্জনের আশা করাই বৃথা। তিনি অসি হস্তে কসাই জিন্নার পায়ে পড়ে কেবল অহিংসার মিউ মিউ করে গেলেন। পৃথক নির্বাচনে জিন্নার জয়জয়কার। তাতে উৎসাহিত হয়ে মুসলমানরা অসিহস্তে হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপরের ইতিহাস সবার জানা।

পরাধীন ভারতে পৃথক নির্বাচন সত্ত্বেও গান্ধী সমেত কংগ্রেস নেতারা মুসলমানদের পায়ে পড়েছে। আর বর্তমানে স্বাধীন খণ্ডিত ভারতে যুক্ত নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দলই ভোটের জন্য মুসলমানদের পায়ে পড়ার প্রতিযোগিতায় মেতেছে। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? দেশ অখণ্ড রাখার জন্য যেমন মুসলমানদের পায়ে পড়া আবার খণ্ডিত ভারতে গদি দখলের জন্য মুসলমানদের পায়ে পড়া। তার চেয়ে ইংরেজ সরকার যে পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছিল তা কি অধিক দূরদর্শী সিদ্ধান্ত ছিল না? মুসলমানদের পায় পড়া থেকে তো অন্তত হিন্দু নেতারা বাঁচতেন। ধুরন্ধর বৃটিশ জাতি এটুকু বুঝতে পেরেছিল হিন্দু মুসলমানে যেদিন মিলন হবে, সেদিন কুকুরের লেজও সোজা হবে!

১৯৪৫-৪৬ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় হিন্দু ভোটারদের কাছে হিন্দু ভোটপ্রার্থীদের ভোট দেবার জন্য যে আবেদন করেছিলেন, হিন্দুরা তাতে কর্ণপাত করেনি; গান্ধী-নেহরুর বুজরুকিতে বিশ্বাস করে নিজেদের পায়ে নিজেরা কুড়ুল মেরেছে। ওই নির্বাচনের আটমাসের মধ্যে হিন্দুরা মুসলিম লীগের হাতে ধনেপ্রাণে মারা পড়েছে এবং এক বছরের মাথায় ভারতকে তিন খণ্ড করে সর্বনাশা পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে— হিন্দুরা সর্বস্বান্ত হয়ে রিফিউজী হয়েছে।

বঙ্গদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) এই ব্যাপারের কুফল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভোগ করিবে। কিন্তু 'ভারত ব্যবচ্ছেদ প্রস্তাব' কার্য্যে পরিণত হইলে, কেবল যে ওই প্রদেশগুলিই ফলভোগ করিবে তাহা নহে; উহাদ্বারা সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা এবং অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিপন্ন হইবে। ভারত-ব্যবচ্ছেদ বিষয়ে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের যে সম্মতি আছে, ক্রীপস্ প্রস্তাব দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। মুসলিম লীগও ভারতের পাঁচটি প্রদেশ (বঙ্গ-আসাম, পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ) ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে; কংগ্রেস বর্ত্তমানে বক্তৃতা দ্বারা পাকিস্তানের নিন্দা করিলেও কোনও প্রদেশ কিম্বা প্রদেশাংশের ''আত্মনিয়ন্ত্রণের'' অজুহাতে ভারত-ব্যবচ্ছেদের নীতি মানিয়া লইয়াছে (বিগত পুণা অধিবেশনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব দ্রষ্টব্য)। অর্থাৎ ক্রীপ্স্ প্রস্তাব, মুসলিম লীগ প্রস্তাব এবং কংগ্রেস প্রস্তাব— এই তিনটির মধ্যেই ভারত-ব্যবচ্ছেদের কথা মানিয়া লওয়া হইয়াছে, যদিও কি প্রকারে, কোন্ অঞ্চলে ব্যবচ্ছেদ হইবে, তাহা লইয়া ইহাদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। আজ প্রশ্ন এই নয় যে কংগ্রেস কতখানি ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছে; ''ভারত ছাড়'' কিম্বা ''এশিয়া ছাড়'' এই ধ্বনিগুলিও প্রধান বিবেচ্য বিষয় নয়। প্রধান প্রশ্ন এই যে— ভারত একটি অখণ্ড দেশ থাকিবে কিনা এবং হিন্দুদের সভ্যতা, ধর্ম, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার এদেশে সুরক্ষিত থাকিবে কিনা। সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একমাত্র হিন্দু মহাসভাই অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা চাহে। প্রকৃত গণতন্ত্রের নিয়মানুসারে শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল নরনারীর সমানাধিকার— হিন্দু মহাসভা এই সমস্ত নীতি পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমাদিগকেই ''সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান'' বলিয়া নিন্দা করা হয়! হিন্দু জাতির স্বত্ব ও স্বাধীনতার উপর যে সকল আক্রমণ হইতেছে সর্ব্বপ্রকার উপায়ে তাহার প্রতিরোধের জন্য হিন্দুদিগকে একতাবদ্ধ হইতে বলিলে কোনও অপরাধ হয়, ইহা আমরা মনে করি না। আমরা হিন্দুর জন্য এমন কিছু চাহিতেছি না, যাহা অপরকে দিতে আমরা প্রস্তুত নই। আমরা বিশ্বাস করি না যে হিন্দু জাতির চিতাভস্মের উপর ভারতের স্বাধীনতা-সৌধ নির্ম্মিত হইতে পারে। আমাদের মাতৃভূমির একত্ব ও অখণ্ডত্ব ভাঙ্গিয়া দিয়া কাহারও সহিত কোনও সন্ধি করিবার অধিকার কোনও প্রতিষ্ঠানের, দলের বা ব্যক্তির আছে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না।

হিন্দু মহাসভা বহু প্রবল বাধা-বিপত্তি ও অসুবিধার মত নির্ব্বাচনে অবতীর্ণ হইয়াছে। এই সকল বিষয়ে ব্যাপক প্রচার, দলসংগঠন ইত্যাদি কার্যের জন্য প্রচুর আয়োজন আবশ্যক। কোন কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সম্বল সঙ্গতি আমাদের অপেক্ষা বেশি। সেই জন্যই আমি আপনার নিকট এই ব্যক্তিগত আবেদন প্রেরণ করিতেছি। আমার অনুরোধ আপনি সকল দিক বিবেচনা করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগের হিন্দু মহাসভার মনোনীত প্রার্থী অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার অবৈতনিক সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরীকে সমর্থন করা নিজের কর্ত্তব্য মনে করিবেন। হিন্দুজাতির স্বার্থ-সম্মান রক্ষার ভার যেমন হিন্দু মহাসভার উপর, তেমনি আপনার উপরও ন্যস্ত আছে। জাতীয় জীবনের এই সঙ্কটকালে আমরা উভয়ে একত্রে কাজ করিলে, হিন্দু জাতীয় স্বার্থ রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানের স্বাধীনতাও অর্জন করিতে পারিব।

শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
সভাপতি, অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা
৭৭নং আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা,
২৭ অক্টোবর, ১৯৪৫

বিঃ দ্রঃ *প্রার্থী ও নির্বাচন কেন্দ্রের নাম বাদ দিলে সারা ভারতের সমগ্র হিন্দু সমাজের প্রতি ড. মুখোপাধ্যায়ের এই আবেদন আজও সমভাবে প্রযোজ্য। এবার হিন্দুরাই দেশ ভাগের বীজবপন, জলসিঞ্চন ও সার প্রয়োগে হাত লাগিয়েছে।*

চাষি ভাইরা, আত্মহত্যা করে দিদিকে চাপে রাখবেন না প্লিজ

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

দিদি,

এই চিঠি যখন লিখছি তার ক'দিন আগেই আপনি একটা অভিনব একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। মহাকরণের ঘরে বসে তিন বৈদ্যুতিন সংবাদ মাধ্যমের তিন সাংবাদিককে একসঙ্গে এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার দিলেন। সাংবাদিকরা ভাবলেন, আহা, মুখ্যমন্ত্রীকে একান্তভাবে পাওয়া গেল! দেখতে দেখতে দিদিভাই আমার যেটা মনে হচ্ছিল জানি সেটা আপনারও ভাবনা। আসলে সেদিন আপনি বুঝিয়ে দিলেন মিডিয়াতেও আপনার একটা 'আমরা- ওরা' আছে। সেখানে আবার আজ যে 'আমরা', কালই সে হতে পারে 'ওরা'। আবার উল্টোটাও হয়। একই সঙ্গে আপনি ওই তিন সংবাদমাধ্যমকে ব্যবহার করে বিরোধী দল এবং বিরোধী মিডিয়াদের বুঝিয়ে দিলেন আপনার শক্তি। সত্যি দিদি, আপনার এত বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারা যায় না। এর ক'দিন পরই আপনি পাত্র-মিত্র সহ সুন্দরবন ভ্রমণে গেলেন। শীতটা আপনার মন্দ গেল না। গ্রীষ্মটাও খারাপ যায়নি। জ্যোতিবাবু বোকার মতো ছুটি কাটাতে উত্তরে যেতেন। কিন্তু আপনি সরকারি সফরে গ্রীষ্মে পাহাড় আর শীতের হালকা রোদ্দুরে প্রথমে ঝাড়গ্রাম হয়ে দীঘা, মন্দারমণি এবং তারপরেই সুন্দরবন প্যাকেজ ট্যুরে সেরে নিলেন। কেউ বলতে পারবে না প্রমোদ ভ্রমণ। কারণ, আপনি তো গেছেন উন্নয়নের ঘোষণা করতে। দিঘার সৈকতে বালিতে হাঁটলেন, সজনেখালির পাখির ডাক শুনলেন, ম্যানগ্রোভ দেখলেন, বিদ্যাধরীতে লঞ্চও চালালেন। লঞ্চের ডেকে বসে মন্ত্রী, সান্ত্রী, পাত্র, মিত্র, মোসায়েব পরিবৃত হয়ে কাঁকড়া ভাজা খেতে খেতে কফির কাপে চুমুক দিলেন। মোসায়েবরা মিডিয়া কাঁপিয়ে প্রচার করল, মুখ্যমন্ত্রী আয়লা দুর্গতদের গ্রাম দেখলেন, নদীর পাশে দাঁড়ানো মানুষকে হাত নাড়লেন, পাখিরালয় গ্রামে গিয়ে বাচ্চাদের পটাটো চিপস কিনে দিলেন। সত্যি দিদি বুদ্ধির তারিফ করতেই হয়। বইমেলা, শিল্পমেলা, এসবের মাঝে দু'দুটো প্যাকেজ ট্যুর হয়ে গেল। কেউ প্রশ্ন তুলতেই পারল না, রাজ্যে যখন কৃষক আত্মহত্যা করছে, চিকিৎসা না পেয়ে শিশুরা মরছে তখন মুখ্যমন্ত্রী কেন বেড়াচ্ছেন?

এই কৃষক আত্মহত্যা নিয়েও দিদি আপনার বড্ড পিছনে লেগেছে বিরোধীরা। এমনকী ঘরের শত্রু কংগ্রেসও! ভাবুন, আপনি না থাকলে কোথায় থাকত ওরা? এতকাল তো বিরোধীর আসনেই বসে কাটিয়েছে। কিন্তু ওরা না সঙ্গে থাকলে আপনিও কি ক্ষমতায় আসতে পারতেন? বলুন! সরকারি খরচে কাজের নামে একা ঘুরে বেড়াতে পারতেন? কে জানে!

দিদি, আর একটা কথা আমি বলে দিই। কংগ্রেসের দিল্লি নেতৃত্বকে কিন্তু একদম বিশ্বাস করবেন না। জানি আপনি করেনও না। ওরা সাপের গালেও চুমু খাচ্ছে আবার ব্যাঙের গালেও চুমু খাচ্ছে। প্রদেশ নেতাদের বলছে তোরা দিদির পেছনে লাগ, আমরা কিছু বলব না। এদিকে আপনাকেও টাকা দেওয়ার লোভ দেখিয়ে কিংবা টোপ ঝুলিয়ে সঙ্গে রেখে দিয়েছে। আসলে পাঁচ রাজ্যের ভোটে আপনি যে ওদের বিরুদ্ধে ভোটে লড়ছেন সেটা মেনে নিতে পারছে না। তাই তো জয়রাম রমেশ এসেও প্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আপনাকে একচোট গাল দিয়ে গেল। বলল কিনা, ওদের জন্যই আপনি ক্ষমতায়! হোক না সেটা সত্যি কথা তা বলে অমন প্রকাশ্যে সেটা কেউ বলে?

আবার দেখুন মনোজ চক্রবর্তীর ব্যাপারটা। উনি আপনাকে যা নয় তাই বললেন। এমনকী আপনার পারফরম্যান্স নিয়েও প্রশ্ন তুললেন। কিন্তু দল ওঁকে কিচ্ছু বলল না। উল্টে ওনাকে আপনার মন্ত্রিসভাকে 'ছেঁড়া জুতোর মতো ফেলে দেওয়ার' পারমিশন দিয়ে দিল।

তবে একটা কথা দিদি আপনাকে না বলে পারছি না। কৃষক মৃত্যু নিয়ে আপনি এটা কি করছেন? বামেরা বলছে আপনার আমলে নাকি এই চিঠি লেখা পর্যন্ত ২৯ জন কৃষক আত্মঘাতী হয়েছেন। আর আপনি প্রচার করছেন— না, ওটা একজন। বাকিরা কৃষক নয়, 'ধান্য ব্যবসায়ী'। সে যাই হোক, দিদি আপনার রাজ্যেরই তো মানুষ। তাছাড়া, আট মাসের অভাবে কেউ আত্মঘাতী হয় না। একটা সর্বদলীয় তদন্ত করলে কি এমন ক্ষতি হোত? হয়তো দেখা যেত বাম আমলের ঋণের বোঝাই আত্মহননের কারণ। বিরোধীদের মুখটা তো বন্ধ করা যেত। এরপর সেই পরিবারগুলোকে একটা আর্থিক সাহায্য করলে আপনার টি আর পি অনেকটাই বাড়ত। মদ খেয়ে মারা যাওয়া পৌনে দুশো মানুষকে আপনি ২ লাখ টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা করে দিলেন, আর কটা কৃষকের পরিবারকে ক'টা টাকা দিলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হোত? রাজ্যের এই টানাটানির সংসারেও ৮০০ ক্লাবকে ১৬ কোটি টাকা দিতে পারলেন আর ক'টা টাকা কৃষক পরিবারের জন্য বরাদ্দ করলে আপনার উন্নয়ন কি থমকে যেত দিদি? শেষে একটা কথা বলি দিদি, নবজাতকের মৃত্যু বন্ধ করার চেষ্টা করুন প্লিজ। যদি নাও পারেন, দোহাই আপনাকে অন্য রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করে শিশু মৃত্যু নিয়ে কম্পিটিশনে নামবেন না।

নমস্কারান্তে,
—সুন্দর মৌলিক

চিঠিপত্র

হুকিং করে বিদ্যুৎ চুরি

সংবাদে প্রকাশ অবৈধভাবে হুকিং করে বিদ্যুৎ চুরি আটকাতে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা ১ ডিসেম্বর ২০১১ মগরাহাট থানার নৈনানে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা মল্লিকপাড়াতে গিয়েছিল। তাদের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই পুলিশ সঙ্গে গিয়েছিল। ঘটনার দিন ঘটনাস্থলে বিদ্যুৎকর্মীরা বেআইনিভাবে নেওয়া বিদ্যুৎ লাইনের হুকিং ছিন্ন করতে শুরু করতেই, আগে থেকে প্রস্তুত থাকা গ্রামবাসীরা লাঠিসোটা বোমা প্রভৃতি নিয়ে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের আক্রমণ করে। পুলিশ বিদ্যুৎকর্মীদের রক্ষা করতে এলে তাদেরকেও আক্রান্ত হতে হয়। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়। এতে দু'জনের মৃত্যু হয়। তাই ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়ল প্রায় সব রাজনৈতিক দলের নেতারা। দোষী-নির্দোষ দেখার প্রয়োজন নেই। ফায়দা লোটাই একমাত্র উদ্দেশ্য।

এখন প্রশ্ন হুকিং করে এই বিদ্যুৎ চুরির ঘটনা কি ঘটতেই থাকবে? বিদ্যুৎ চুরির ফলে যে লোকসান হতে থাকবে সেটা কি আমাদের মতো সাধারণ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিদ্যুৎ-এর বিল-এর সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হবে? স্থানীয় বিধায়ক বা সাংসদরা নিশ্চয়ই সে দায়ভার নেবেন না। এরপর থেকে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা কি অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ-এর হুকিং কাটতে মুসলিম অধ্যুষিত ওই সমস্ত এলাকায় যাবেন? অবশ্যই যাবেন না। আর পুলিশ? এই দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কুলপি, মগরাহাট, জীবনতলা এলাকায় মাত্র ৩৮ দিনের মধ্যে ৩ বার পুলিশের ওপর ভয়ঙ্কর আক্রমণের ঘটনা ঘটল। কারণ কি? রাজনৈতিক নেতাদের উস্কানি না অন্য কিছু? সব কিছু পর্যালোচনা করলে নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে বর্তমান সরকারের আমলে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় আক্রান্ত হলে পুলিশ মণ্ডা মেঠাই ছুঁড়তে পারে তবে কখনই গুলি ছুঁড়বে না। একে তো আক্রান্ত হলে আহত হয়ে হাসপাতালে শয্যাশায়ী থাকতে হবে, তার ওপর দোষী প্রমাণিত হয়ে, হ্যাঁ অবশ্যই দোষী প্রমাণিত হয়ে অপসারণ অবনমন বা কারাবাস। এর থেকে অপমান আর কি হতে পারে? হ্যাঁ আরও আছে। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সেখান থেকে মর্গে চালান হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। কারণ দুষ্কৃতীদের, থুড়ি আন্দোলনরত জনতার হাতে ইনসাস, এ কে ৪৭ সহ নানা কিসিমের আধুনিক অস্ত্র থাকে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদীয়া উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর মুসলিম সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় তাই অবৈধভাবে হুকিং করে বিদ্যুৎ চুরির ঘটনা ঘটতেই থাকবে। আর তার দায়ভার নেবে 'অবিশ্বাসীগণ'।

—**শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দননগর, হুগলী।**

কৃষকের আত্মহত্যা

মাঝে মাঝেই দেখি, গত মাসের ১৫ ও ১৬ তারিখে দৈনিক স্টেটসম্যানে দেখলাম কৃষকের আত্মহত্যার খবর। মর্মাহত হলাম। ইংরেজ আমলে দোষ দিতাম ইংরেজদের। এখন দোষ আমাদের নিজেদের। যাঁরা আমাদের অন্ন যোগায় তাঁরা যদি ঋণে, অভাবে, অনাহারে আত্মহত্যা করেন তখন তার বিহিত অবশ্যই করতে হবে।

প্রথমত, গ্রামে কোন কোন বাড়িতে ভাত হয় না, কোন কোন বাড়ি ঋণের দায়ে তলিয়ে যাচ্ছে তার খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার।

দ্বিতীয়ত, যাঁরা গ্রামে বিত্তবান তাঁরা যাতে সাধ্যমতো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন সেই চেষ্টা করা।

তৃতীয়ত, ইংরেজী নতুন বছরের আনন্দে ও অন্যান্য ঘটনায় আমরা অনেকে বাজি পুড়িয়ে বহু অর্থ অপচয় ও বিনাশ করি, সে অর্থ দিয়ে নরনারায়ণের সেবা ও সাহায্য করা যেতে পারে।

চতুর্থত, প্রয়োজনমতো সরকার কর্তৃক কৃষকের ঋণ মকুবের ব্যবস্থা করা।

—**কৃষ্ণকান্ত সরকার, দমদম।**

অস্ট্রেলিয়া ও ইসলাম

জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ায় মুসলমানরা নাগরিকত্ব পায় না। সেখানে মাদ্রাসা এবং আলিয়ার স্থান নাই কারণ এখানে শিক্ষার নামে হিংসা খুন দেশবিরোধী কাজের শিক্ষা দেওয়া যায় না। জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ার মোল্লা মৌলবাদীর স্থান নেই। ধর্মান্তর চলে না। তালাক (বিবাহ-বিচ্ছেদ) এবং ৪ দফে নিকা (বিবাহ) চলে না। ৪ নিকার ফলে ১৬টা সন্তান। সেই জন্যই জাপ সরকার এবং অস্ট্রেলিয়া সরকার কঠোরভাবে এই নীতি অনুসরণ করে।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী জুলিয়া গিলার্ড বলছেন, পৃথিবীর বহু দেশ মৌলবাদী মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী সমস্যায় জর্জরিত। উগ্রবাদী অশান্ত ব্যধিতে ভুগছে। শরিয়ত আইন অস্ট্রেলিয়ায় চলবে না। সংখ্যালঘু মোর্চা নীতি এই দেশ মান্য করে না। অস্ট্রেলিয়ার ভাষা ইংরাজী। সকলকে ইংরাজীতে কথা বলতে হবে। স্কুলে God-এর ছবি থাকবে। এই সমস্ত নীতি যে মানবে না তাকে বলা হয়— অন্য দেশে চলে যাও।

—**গোপাল দাস, কলকাতা-৫৫।**

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর ''চিঠিপত্র'' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার (যদি থাকে) থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না।

— সঃ স্বঃ

ভারতীয় রেলের যাত্রী পরিষেবা আজ ধ্বংসের মুখে

বিশ্বামিত্র শর্মা

গত কয়েক বছরে ভারতীয় রেলের ক্রমাবনতি মানুষের কাছে দৈনন্দিন যন্ত্রণার কারণ হিসাবে দেখা দিচ্ছে। প্রতিদিন কোনও না কোনও রেল দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড, দায়িত্বজ্ঞানহীন যাত্রী হয়রানির বলি হচ্ছেন হাজার হাজার নিরীহ যাত্রী। আর মাননীয় রেলমন্ত্রী কেবল ফাটা রেকর্ডের মতো ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেই নিজের দায়িত্ব এড়াচ্ছেন। যাত্রী নিরাপত্তার ভাবনা রেল কর্তৃপক্ষের আলোচ্য সূচী থেকে শেষ তিন-চার বছরে একেবারেই মুছে গেছে।

বর্তমান কেন্দ্রের ইউ পি এ-২ সরকারের রেলমন্ত্রক যাত্রী সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্ত কর্মসূচীকে খুবই কম গুরুত্ব দিচ্ছেন। অত্যাধুনিক সিগন্যাল ব্যবস্থা প্রবর্তন থেকে শুরু করে গাড়ীতে গাড়ীতে সংঘর্ষের ফলে ঘটিত সমস্যাগুলিকে মোকাবিলা করার জন্য আশু ব্যবস্থা নেবার যে প্রকল্প ছিল তা তাঁরা বাতিল করেছেন। উপরন্তু বিভিন্ন রেলপথে এক্সপ্রেস বা সুপার ফাস্ট গাড়ির সংখ্যা অতিরিক্ত বৃদ্ধি করে রেলপথের বিশেষ ক্ষতিসাধন করছেন। নিজেদের জনমোহিনী রূপ দেখাতে গিয়ে অতিরিক্ত বহু গাড়ি চালু করে রেল রুটগুলিকেই প্রায় ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করছেন। রেল লাইনের কোনও রক্ষণাবেক্ষণ নেই, নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলিও কর্মীদের অভাবে বেহাল। ফলে রেলপথে ভারতবাসীর ভ্রমণ কেবল আতঙ্ককেই আহ্বান করে। বীভৎস রেল দুর্ঘটনা ও দুর্ঘটনাগ্রস্তদের সাহায্য করতে রেলমন্ত্রকের অমানবিক অনীহা আজ ভারতীয় রেলের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

রেলের যাত্রীদের জন্য ভারতীয় রেলের সরবরাহ করা খাদ্য, জল বা অন্যান্য সামগ্রী বেশ কয়েক বছর ধরেই অত্যন্ত নিম্নমানের হয়ে গেছে। পচা খাবার, দূষিত পরিকাঠামো এমনকী বিষাক্ত জল পরিবেশন করে রেল কর্তৃপক্ষ ক্রমাগত কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে। শেষ দুই মাননীয় রেলমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দীনেশ ত্রিবেদী সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে দারুণ উজ্জ্বল। কিন্তু কাজে অনেকটাই নিস্পৃহ। আরেক রেল প্রতিমন্ত্রী মুকুল রায়। প্রধানমন্ত্রীর আদেশ পর্যন্ত অমান্য করে তিনসুকিয়াতে রেল দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যেতে অস্বীকার করলেন। কিন্তু দুর্বল ইউ পি এ-২ সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কেবল গদি আঁকড়ে থাকার লোভে এসব অনুপযুক্ত রেলমন্ত্রীদের কাছে কোনও কৈফিয়ত তলব করতেও ভয় পান। এত অপদার্থ এই রেল প্রশাসন যে জ্ঞানেশ্বরী কাণ্ডের জেরে দীর্ঘদিন বিহার- পশ্চিমবঙ্গ-ঝাড়খণ্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাতে গাড়ি চলাচল বন্ধ রেখেছিলেন। রেল সুরক্ষা বলে আজ কিছুই অবশিষ্ট নেই। কর্মীদের মনোবলও তাই আজ তলানিতে।

দ্বিতীয় বিষয় হলো রেলের যাত্রীভাড়া বাড়ানো চলবে না! তাতে রেল ব্যবস্থা উচ্ছন্নে যায় যাক। অর্থের অভাবে প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রযুক্তি ব্যবহার বন্ধ রয়েছে, রেল কর্মচারীর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অর্ধেকও নেই। নিয়োগ সম্পূর্ণ বন্ধ হোক বা প্রশাসনই ভেঙে পড়ুক; রেলের যাত্রীভাড়া বাড়ানো চলবে না! যোজনা কমিশন রেলের বিপুল লোকসান সামাল দেবার জন্য ক্রমাগত দরাজ হস্তে অর্থ ভতুর্কি দিচ্ছেন। রেল পণ্য মাশুল বাড়াচ্ছে দ্রুতগতিতে। কিন্তু রেলমন্ত্রী জনপ্রিয় হবার জন্য যাত্রীভাড়া বাড়ানো বন্ধ রাখছেন। জ্বালানীর দাম বাড়লে, কারিগরী ব্যবস্থা মূল্য বাড়লে, কর্মচারীদের বেতন বিন্যাস হলে বেশি অর্থের প্রয়োজন হয়। আর সেই টাকা যাত্রীভাড়ায় প্রয়োজনানুসার বাড়ালে আর্থিক অবস্থা ঠিক থাকে। না হলে এই ব্যবস্থাই ভেঙে পড়ে। সম্প্রতি রেলমন্ত্রী নাটক করে রেলের ওয়েবসাইটে যাত্রীভাড়ার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে জনগণের মত আহ্বান করলেন। কিন্তু আশ্চর্য সেই মত পর্যালোচনা না করেই যাত্রী ভাড়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে রেলের বিভিন্ন সম্পত্তি বিক্রি করে বা ভাড়া দিয়ে অর্থ সংগ্রহের কথা বললেন। এসব অদ্ভুত জনপ্রিয় কর্মসূচী রেল ব্যবস্থাকেই ধ্বংস করতে চলেছে।

এবার কলকাতায় মেট্রো রেলের প্রসঙ্গে আসা যাক। কলকাতায় মেট্রো যাত্রীদের হাহাকার! কোনওরকম পরিকল্পনার তোয়াক্কা না করেই কলকাতার মেট্রো টালিগঞ্জ থেকে গড়িয়া পর্যন্ত বাড়ানো হলো। কোনও গাড়ীর রেক এল না অথচ রেলপথ ১২ কিমি বেড়ে গেছে। গর্বের কলকাতার মেট্রো দুঃস্বপ্নের মেট্রো যাত্রায় আজ পরিণত হয়েছে। এর উপর কিছু বাতিল অব্যবহার্য বাতানুকূল গাড়ী চালু করে রেলমন্ত্রক মেট্রো সার্ভিসে ট্রেনে অগ্নিকাণ্ড, মাঝপথে গাড়ী বিকল বা বাতানুকূল ব্যবস্থা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাত্রীদের ত্রাহিরবের নতুন সমস্ত উৎপাত চালু করেছে।

এ সবের পরিণতিতে কলকাতার মেট্রো ব্যবস্থা আজ জতুগৃহ। কোনও সময়সূচী মেনে ট্রেন চলে না। বিশ্বমানের এই পরিষেবাকে একটি নিন্দিত ব্যবস্থায় আজ রেলমন্ত্রক পরিণত করেছেন।

এহেন বিপর্যস্ত রেলওয়ে ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণের ক্ষোভ-বিক্ষোভ সংবাদের আলোকে আলোকিত হয় না। কয়েকটি প্রভাবশালী সংবাদপত্র বা নিউজ চ্যানেল ইউ পি এ-২ সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেস শাসিত রাজ্য সরকারের ধামাধারী হিসাবে রেলের অপদার্থতাকে দৈনিক আড়াল করে চলেছেন। রেলকে বাঁচাতে চাই সফল প্রশাসক ও সৎ মন্ত্রীগোষ্ঠী। অযোগ্য-অসৎ- প্রচারলোভী রেলমন্ত্রী বা সরকার ভারতীয় রেলকে গ্রাস করে একে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে চায়।

শিবরাত্রি উৎসব

নবকুমার ভট্টাচার্য

মানুষ বিবর্তনের পথে হাঁটতে হাঁটতে বিভিন্ন সময়ে বিবিধ জগৎ রচনা করেছে। এই সৃষ্টিরূপের শুরু পশুদেবতা থেকে এবং শেষ সমাজের উঁচুতলার মানুষের অনুরূপ চরিত্রকে দেবতায় রূপান্তর। সারা বিশ্বের অপরিশীলিত পুরাণকথায় বলা হয়েছে যে পৃথিবীর সৃষ্টি কোনও এক স্রষ্টার দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে। বায়বীয় সংহিতায় বলা হয়েছে, পৃথিবীর যাবতীয় কিছুই শিবের শরীরজাত। এই স্থূল সূক্ষ্মাত্মক বিশ্বে সূর্য চন্দ্র গ্রহ তারা নক্ষত্র দেব দৈত্য রাক্ষস মানুষ— এছাড়া সমস্ত জঙ্গম পশুপাখি, কীটপতঙ্গ লতা, বৃক্ষাদি সমস্তই শিব থেকে উৎপাদিত এবং সেখানেই সমাহিত। পুরাণের একটি কাহিনীতে ব্রহ্মা মহেশ্বর শিবকে আপন অঙ্গ থেকে সৃষ্ট পুত্রের মর্যাদা দিয়েছেন এবং তারপর শিবের কাছে প্রার্থনা করেছেন তাঁকে সৃষ্টিকার্যে সাহায্য করতে। এই সৃষ্টি কার্যের জন্য শিব নিজেকে সমাধিস্থ করলেন। ব্রহ্মাকে খুশি করতে প্রজাসৃজন করলেন। পরবর্তীতে শিবপুরাণ ও জ্ঞানসংহিতা গ্রন্থ মতে মহাদেবের আজ্ঞায় ব্রহ্মা হয়েছেন সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু হলেন সৃষ্টির পালক এবং শিবেরই অংশে পড়লো সৃষ্টির ধ্বংসকর্ম। এখানে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও তিনি একদিকে যেমন সৃষ্টিকার্যে রত অন্যদিকে তেমনি ধ্বংসের দ্বারা পুনঃসৃষ্টির নিয়ন্তা। শরীরের যেমন মাতা-পিতা আছে তেমনি আত্মার মাতা বা পিতা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব। সাংখ্য দর্শনে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে জীবাত্মা অনেক কিন্তু পরমাত্মা এক। সুতরাং জীবাত্মা যখন এক পরমাত্মা শিবের স্মরণে নিমজ্জিত হয় তখন প্রাপ্তি আরম্ভ হয়— এটাই জ্ঞান। এই জ্ঞান ও রাজযোগ সহকারে ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করাতেই শিবরাত্রির মাহাত্ম্য।

মহাদেব মহেশ্বর জগতের কর্তা। স্রোতে যেমন জল এবং অরণিতে অগ্নি ব্যাপ্ত হয়ে আছে, তেমনি আত্মার মধ্যে আত্মা থেকে বিলক্ষণ এই মহাত্মা ব্যাপ্ত হয়ে আছেন। সত্য এবং তপস্যার দ্বারা নিত্যযুক্ত ব্যক্তি তাঁকে এভাবে দর্শন করেন। তবে সমস্ত জগৎই শিবের অনুগ্রহ লাভ করে। তিনি সবাইকেই অনুগ্রহ করেন, কাউকে নিগ্রহ করেন না। শিব সকলকে হিতে নিযুক্ত করেন তাই তিনি সর্বানুগ্রাহক। শিবরাত্রি ব্রতের কাহিনীটি বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় তিনি কত দয়ালু। সেজন্য একমাত্র শিবকেই পিতারূপে মান্য করা হয়। শিবকে বলা হয় শিববাবা। পবিত্র বেলগাছের ওপর উঠে সারাদিন শিকার না পেয়ে ঘুরে ঘুরে লুব্ধক নামে ক্লান্ত এক ব্যাধের রাত কাটানোর অবকাশে গাছের পাতা আর শিশিরের জল নিচের মাটিতে পোঁতা শিবরূপী প্রস্তর খণ্ডের উপর পড়লে, আশুতোষ মহাদেবের বরে সে অজ্ঞাতেই মহাপুণ্যবান বলে গণ্য হলো এবং তার মৃত্যুর পর শিবদূতেরা যমদূতদের পরাস্ত করে তাদের হাত থেকে তার আত্মাকে কেড়ে নিয়ে কৈলাসে হাজির হলো যথাকালে। স্পষ্টতই শিব যে ব্যাধের উপাসিত দেবতা পুরুষানুক্রম প্রচলিত স্মৃতিকাহিনী এই ব্রতকথার প্রথম অংশে প্রতিভাসিত। মহাভারতেও রয়েছে কিরাত অর্জুন কাহিনী। শিবরাত্রি উপলক্ষে শিবলিঙ্গের মাথায় জল বা দুধ ঢালার রীতি সুপ্রাচীনকাল ধরেই চলে আসছে। লিঙ্গপুজো অবশ্যই উর্বরতা-নির্ভর একটি পরম্পরার প্রতীক।

মহানির্বাণতন্ত্রের চতুর্দশ উল্লাসে বলা হয়েছে— শিব শব্দের অর্থ মঙ্গলময়। লিঙ্গ শব্দের অর্থ যাতে সমগ্র জগৎ লয়প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ব্রহ্ম। গৌরীপট্ট শিবলিঙ্গের আধার। গৌরীপট্টের অর্থ জগতের যোনি। মূল প্রকৃতি অর্থাৎ মহামায়া। এর দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে গৌরীপট্টযুক্ত শিবলিঙ্গ মূলপ্রকৃতিযুক্ত ব্রহ্মের অনুকল্পমাত্র। শক্তি সঙ্গমতন্ত্রে শিব নিজেই বলেছেন, আমি পুরুষরূপে, স্ত্রীরূপে আমিই দেবী। আমার মধ্যে ভেদ নেই। যে ভেদ কল্পিত হয় তা অজ্ঞানতার জন্য। শিব শব্দের অর্থ মঙ্গলময়। শিবরাত্রি তিথি হচ্ছে সেই মঙ্গলময়ের আরাধনার শ্রেষ্ঠ তিথি।

পরম্পরা

ঐতিহাসিক দুর্গ পুরন্দর

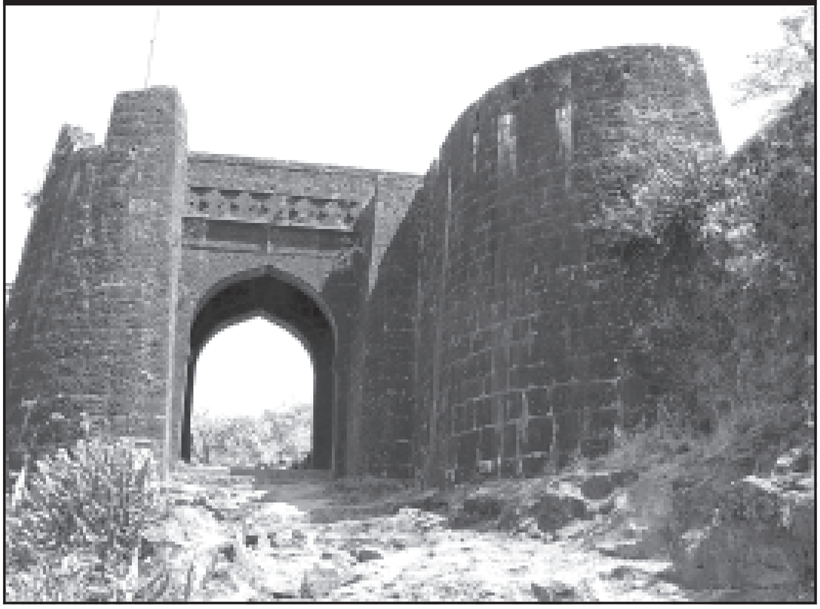

সোমশুভ্র চক্রবর্তী

মহারাষ্ট্রের রাজধানী পুণার ২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে, পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ৪,৪৭২ ফিট উচ্চতায় স্থাপিত পুরন্দর দুর্গ ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের হিন্দবী ''স্বরাজ্যের'' অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল।

দুর্গম খাড়াই পাহাড়ের ওপর ঘন জঙ্গলের মধ্যে অবস্থানের ফলে পুরন্দর বহিরাক্রমণকারীদের কাছে ছিল দুর্ভেদ্য। পুরন্দরের পূর্বে অবস্থিত বজ্রাগড় দুর্গ এবং উভয়ের মাঝে ''ভৈরবখিণ্ড'' গিরিসংকট পুরো অঞ্চলটিকে সুদৃঢ় প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রদান করেছিল। পুরন্দর দুর্গের দুইটি অংশ— ''বালকিল্লা'' ও ''পুরন্দর'', পাদদেশ থেকে যাদের উচ্চতা যথাক্রমে ২০০০ ও ২১০০ ফুট। দুই অংশের মাঝে ৪০টি বুরুজ দ্বারা সুরক্ষিত ''বিনি দরওয়াজা'', দুর্গের একমাত্র প্রবেশদ্বার, শক্তিশালী ''বালকিল্লা'' অংশের অন্যতম দর্শনীয় স্থানগুলি হলো--- মহালক্ষ্মী মন্দির, ''দিল্লী দরওয়াজা'' ও দুর্গের সর্বোচ্চ অংশে অবস্থিত কেদারেশ্বর মহাদেব মন্দির। ''পুরন্দর'' অংশের মূল আকর্ষণ পেশোয়া বাজীরাওয়ের তত্ত্বাবধানে নির্মিত পুরন্দরেশ্বর মহাদেবের মন্দির। এই অংশের অন্যতম দর্শনীয় স্থানগুলি হলো পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ দ্বারা নির্মিত রামেশ্বর মন্দির, সোয়াই মাধবরাও পেশোয়ার জন্মস্থানের ধ্বংসাবশেষ এবং বীর মুরারবাজী দেশপাণ্ডের প্রস্তরমূর্তি।

মধ্যযুগে বিভিন্ন সময়ে দুর্গটি বিজাপুর, বিদর ও আহমেদনগরের সুলতানদের অধিকৃত ছিল। ১৫৯৬ সালে আহমেদনগরের সুলতান বাহাদুর শাহ ছত্রপতি শিবাজীর মাতামহ মালোজী ভোঁসলেকে পুণা এবং সুপার জায়গীর প্রদান করেন, পুরন্দর যার অন্তর্গত ছিল। ১৬৪৮ সালে আদিলশাহী শাসনভুক্ত পুরন্দরকে ছত্রপতি শিবাজী দুর্গরক্ষক নীলকণ্ঠ সরনাইকেরির সাহায্যে তার উদীয়মান স্বরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কিছুদিনের মধ্যেই পুরন্দর দুর্গে শিবাজী ও তার সৈন্যদলকে আদিলশাহী সেনাপতি ফতেখানের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়। বিপুল সংখ্যক আদিলশাহী বাহিনীর আক্রমণ বীর মারাঠাগণ প্রবল বিক্রমে প্রতিহত করেন। চারপাশের ঘন জঙ্গল থেকে মারাঠাদের তীব্র তীর বর্ষণে ও দুর্গপ্রাকার থেকে তোপ, বন্দুকেরগুলি ও বিশাল পাথরের চাঁইয়ের আঘাতে আদিলশাহী সৈন্যদলের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয়। শিবাজীর আদেশে ফটক খুলে মারাঠাবীরগণ ঝাঁপিয়ে পড়েন আগুয়ান আদিলশাহী বাহিনীর ওপর। তাদের ভীষণ আক্রমণে নাজেহাল শত্রুবাহিনী পিছু হঠতে শুরু করে। প্রবল ঝঞ্ঝার ন্যায় মারাঠা বীরগণ শত্রুসৈন্য সংহার করেন। মারাঠাদের রণকৌশল ও পরাক্রমে শত্রুসৈন্যদলের অতি ক্ষুদ্র অংশই বিজাপুরে পালাতে সক্ষম হয়। পুরন্দরের এই বিজয় মারাঠাবাহিনীর আত্মবিশ্বাস সহস্রগুণ বর্ধিত করে তোলে। ১৬৬৫ সালে মির্জারাজা জয়সিংহ ও দিলের খানের নেতৃত্বে বিশাল মুঘলবাহিনী পুরন্দর অবরোধ করে। বীর দেশপ্রেমিক ও স্বরাজ্যের সেবায় উৎসর্গীকৃত যোদ্ধা মুরারবাজী দেশপাণ্ডের স্কন্ধে পুরন্দর রক্ষার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন ছত্রপতি শিবাজী। নিকটস্থ বজ্রাগড় দুর্গ শত্রুসৈন্যদ্বারা অধিকৃত হওয়ার পর প্রায় চল্লিশ হাজার মুঘল সৈন্যদ্বারা চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ হয় পুরন্দর দুর্গের চার হাজার মারাঠাবীর। মুরারবাজীর নেতৃত্বে তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে বিদ্যুৎবেগে মুঘল শিবিরে আঘাত হেনে দুর্গে প্রত্যাবর্তন করেন। মারাঠাদের এই গেরিলাযুদ্ধে মুঘলপক্ষের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয়। দীর্ঘ একমাস যাবৎ প্রবল বিক্রমে মুঘলদের আক্রমণ প্রতিহত করে পালটা আক্রমণ চালাতে থাকে তারা, উভয়পক্ষের গোলাগুলি বর্ষণে উভয়পক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হয়। অবশেষে মরণপণ সংগ্রামের সংকল্প নিয়ে মুরারবাজী নির্বাচিত সাহসী সাতশ যোদ্ধা নিয়ে দিলের খানের নেতৃত্বে ধেয়ে আসা পাঁচ হাজার শত্রুসৈন্যর ওপর ''হর হর মহাদেব'' ধ্বনি সহকারে সিংহবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাদের সাহস, যুদ্ধ নৈপুণ্য ও বীরত্বে মুগ্ধ দিলের খান যুবক মুরারবাজীকে বহুমূল্য পুরস্কারের বিনিময়ে মুঘলপক্ষে যোগদানের আহ্বান জানান। ছত্রপতির বিশ্বস্ত সৈনিক মুরারবাজী তা অগ্রাহ্য করে দিলের খানকে আক্রমণ করেন। দিলের খানের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধে মুরারবাজী বীরগতি প্রাপ্ত হন, তার বলিদানে ধন্য হয় পুরন্দরের ভূমি। তিনশত মারাঠাবীর রণশয্যা গ্রহণ করেন সেই যুদ্ধে। অবশিষ্ট মারাঠাগণ দুর্গে প্রত্যাবর্তন পূর্বক তুমুল সংগ্রাম জারি রাখেন। অবশিষ্ট বীর সৈনিকদের মূল্যবান প্রাণ রক্ষার্থে শিবাজী মহারাজ জয়সিংহের সঙ্গে ''পুরন্দর চুক্তি'' স্বাক্ষরিত করেন। যার শর্ত অনুসারে শিবাজীকে পুরন্দর ও আরও তেইশটি দুর্গ মুঘলদের সমর্পণ করতে হয়। কিন্তু ১৬৭০ সালে শিবাজী পুরন্দরকে পুনরায় স্বরাজ্যের অধিকারে আনতে সক্ষম হন, দুর্গে ভগোয়া ঝাণ্ডা সগৌরবে উড্ডীন হয়। পুরন্দরে ১৪ মে ১৬৫৭ সালে শিবাজী পুত্র সম্ভাজীরাজের জন্মগ্রহণ করেন। পেশোয়াদের শাসনকালে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল পুরন্দর। পেশোয়াদের রাজধানী পুণা শত্রসৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হলে তাঁরা পুরন্দর দুর্গে আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করতেন। ১৮১৮ খৃস্টাব্দে বৃটিশদের অধিকৃত হয় পুরন্দর। বর্তমানে এই দুর্গ ''NCC'' এর এক অন্যতম কেন্দ্র। বীর মুরারবাজীর চরম বলিদানের সাক্ষী পুরন্দর আজও যেন হিন্দবী স্বরাজের জয়ঘোষে গগন বিদীর্ণ করছে।

ভারতের জমি-ব্যবস্থার সেকাল-একাল

গোপীনাথ দে

সংবিধানে ভূমি যেহেতু রাজ্যের পূর্ণ এক্তিয়ারে সেই কারণে এক একটি রাজ্য তার পরিস্থিতি পরিবেশ এবং শাসকদলের নীতি ও আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে আর ভোটের রাজনীতির মাপকাঠিতে ভূমি সংস্কার আইন একএকটি রাজ্যে এক একরকম করেছে। ভূমি রাজ্যের এক্তিয়ারে থাকলেও সারা ভারতের সকল কৃষকের সমতা রক্ষার স্বার্থে বা সকল কৃষকের সমান সুযোগ রক্ষার স্বার্থে কেন্দ্র সরকারের একটা নীতি-নির্দেশিকা থাকা উচিত ছিল, যা কেন্দ্র সরকার করেনি।

গুপ্তযুগে রাজা রাজ-কর্মচারীদের বেতন দানের পরিবর্তে জায়গির দানের প্রথা প্রচলন ছিল। তবে এই প্রথার নাম ছিল 'ভূমি দান' বা 'ভূদান'। এবং রাজকর্মচারীর বংশধরেরা যদি রাজকর্মচারী না-ও হোত তবুও ওই ভূমির অধিকার বংশানুক্রমে থাকত। এসব বাদেও গ্রামের প্রধানকে (মণ্ডল প্রধান বা মোড়ল) সর্বসাধারণের কাজের জন্য যথা দেব-দেবীর পূজা এবং টোল ইত্যাদির জন্য ভূমিদাস প্রথার প্রচলন ছিল সেকালে।

তুর্ক-আফগান বা সুলতানি যুগে এই ভূমিদান বা ভূদান প্রথা চালু ছিল তবে কিছু পরিবর্তন ঘটে ছিল। রাজকর্মচারীদের যে ভূমিদান করা হোত তা বংশানুক্রমে অধিকার পেত না। অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সব ভূমিদান করা হোত তা অবস্থা বুঝে কখনও, কখনও অধিকার রদ করে ভূমি ফেরত নেওয়া হোত। প্রাক-মুঘল যুগে বিশেষ করে আলাউদ্দিন খলজির সময় ভূমিব্যবস্থার প্রায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন অন্য কোনও কারণে নয় বরং বলা যায় রাজকোষের আয় বৃদ্ধি ঘটানোই ছিল মূল্য লক্ষ্য। তাই মধ্যস্বত্ব লোপ করার পক্ষে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন আলাউদ্দিন খলজি। যে অগণিত প্রান্তিক কৃষককুল নিজ হাতে জমি চাষ করতেন, সেই কৃষকদের সঙ্গে রাষ্ট্রের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। কোনও ধরনের মধ্যস্বত্ব ছাড়াই কৃষকের উৎপাদিত ফসলের অর্ধাংশ খাজনা বা ভূমিরাজস্ব বা খারাজ ধার্য করেছিলেন। বাকি অর্ধেক কৃষক তাঁর নিজের অধিকারে রাখতে পারতেন।

এরপর শেরশাহ (১৫৪০—৪৫) আরও কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। তিনি বিভিন্ন জমির জরিপ ও আনুষঙ্গিক পরীক্ষা করিয়ে উৎপাদিকা-শক্তি মোতাবেক বিভিন্ন জমির ওপর ভূমিরাজস্ব ও তাদের স্বতন্ত্র চরিত্র নির্ধারণ করেছিলেন। ভূমি-ব্যবস্থায় এখনও যে 'পাট্টা' এবং 'কবুলিয়ত' প্রভৃতি নামের শব্দগুলির প্রচলন আছে তার প্রথম প্রবর্তক শেরশাহ এবং এই বিশেষ ধরনের প্রথা প্রচলনের মাধ্যমে তিনি একই সঙ্গে জমির ওপর রাষ্ট্রের স্বত্ব ও কৃষকের অধিকার, দুটি উদ্দেশ্যেরই সফল রূপায়ণ ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু মুঘল যুগের সূচনাতেই পুনরায় ফিরে এসেছিল 'জায়গির' প্রথা। রাষ্ট্রের আয়ের প্রধান উৎস ছিল জায়গির প্রথার মাধ্যমে সংগৃহীত রাজস্ব। আকবর (১৫৫৬—১৬০৫) এই জায়গির প্রথারই এক পরিমার্জিত এবং বিকেন্দ্রায়িত রূপ দিয়েছিলেন মনসবদারি প্রথার মাধ্যমে। এই মনসবদারিপ্রথা কিছুটা উদার হলেও, তিন-চার বছর অন্তর বিভিন্ন অঞ্চলের মনসবদারদের বদলি-প্রথা চালু থাকার ফলে, স্বল্প সময়ে সর্বাধিক ফয়দা তোলার জন্য সব মনসবদাররা সর্বদাই কৃষকের উপর চাপাতেন বাড়তি রাজস্ব, কর-শুল্ক ইত্যাদির বোঝা।

সুতরাং মনসবদারি বা জায়গির প্রথার মাধ্যমে তখনকার দিনে কৃষকদের উপর বেড়ে চলেছিল শোষণ ও পীড়নের মাত্রা। স্বাধীনতার পূর্বে যে জমিদারি প্রথা ছিল তা মুঘল যুগেরই অনুরূপ বলা যায়। আবুল ফজলের আইনি-ই- আকবরী গ্রন্থের মাধ্যমে জানা যায় বাংলা (অখণ্ড), বিহার, ওড়িশা, খান্দেশ, গুজরাত আগ্রা-দিল্লি, লাহোর, আজমের অর্থাৎ মুঘল শাসিত ভারতের সর্বত্রই কোনও না কোনও ধরনের জমিদারি প্রথা প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদাররা বিভিন্ন নামে পরিচিত হতেন যথা— মাফরোজিয়ান, মুকাদ্দামান ইত্যাদি। সে যুগেও জমিদারি-স্বত্ব হস্তান্তর যোগ্য ছিল, বিক্রয় বা ইজারার মাধ্যমে। ফলে ছোটবড় অসংখ্য জমিদারের আবির্ভাব ঘটেছিল। একদিকে জমিদারতন্ত্র এবং অন্যদিকে কৃষকের হাতে দখলি স্বত্ব বংশানুক্রমে থাকলেও কৃষকের দুর্দশার শেষ ছিল না। খাজনা বা উৎপন্ন ফসলের ভাগ নিয়ে চলত দমন পীড়ন।

মুঘল যুগ শেষ হলে এল ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির বা ঔপনিবেশিক যুগ। ঔপনিবেশিকদের স্বার্থে ভূমিব্যবস্থাতেও এল পরিবর্তন। মুঘল শাসনের সময় কৃষক সমাজ শোষিত হলেও, গ্রামসমাজের বৈচিত্র্যময় অসংখ্য হস্তশিল্প বা কুটিরশিল্প গ্রামগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা দিয়েছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক যুগে বৃটিশ শাসকদের স্বার্থে ভূমিব্যবস্থার বিন্যাস ঘটানো হলো, সঙ্গে সঙ্গে প্রবহমান হস্তশিল্প বা কুটির শিল্পের উপরও পরিকল্পিতভাবে আঘাত হানা হতে থাকল; ফলে বৃটিশ আমলে একের পর এক ঘটতে থাকল দুর্ভিক্ষ। ফলে ১৭৭০ সালে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের ঘটনা ঘটল। এবং বাংলার প্রায় এককোটি মানুষ অর্থাৎ বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মারা গিয়েছিলেন।

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করে ইংরাজ সরকার ভূমি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাল। প্রায় ১৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কৃষক সমাজের বড় অংশ বন্দী হয়ে রইল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জাঁতাকলে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে প্রকৃত কৃষকের হাত থেকে জমির মালিকানা এবং দখলিস্বত্ব ছিনিয়ে নেওয়া হলো। পরিবর্তে জমিদার বা মধ্যস্বত্ব ভোগীদের মালিকানাস্বত্ব আইনি স্বীকৃতি পেল। মুঘল আমলে যারা ছিল রাজস্ব-সংগ্রহকারী নায়েব-গোমস্তা ও বৃটিশ শাসকদের বংশবদ বিভিন্ন ধরনের রাজকর্মচারী

খেলা

বিদেশে আরও একটা লজ্জাকর ক্রিকেট সিরিজ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

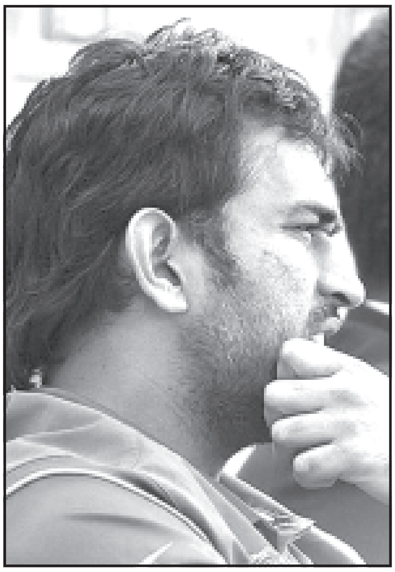

ইংল্যান্ডের পর অস্ট্রেলিয়া, বিপর্যয়ের চিত্রনাট্য একইরকম রয়ে গেল। ঘরের মাঠে সিংহ, বিদেশে ইঁদুর। এই সত্যটি সযত্নে বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ ভারতীয় ক্রিকেটাররা। যদিও ইদানিংকালে স্পনসরদের সৌজন্যে বিদেশে গুটিকয়েক গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট জিতেছে ভারত। যেমন গত বছর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়ে ডারবানের সবুজ, স্পোর্টিং উইকেটে জয় এখনও মনে হয় অবাস্তব বিস্ময়। দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে সিরিজ ড্র করে আসাটা কি করে সম্ভব হলো, তা নিয়ে তদন্ত হওয়া উচিত। যেমন হওয়া উচিত দেশের মাঠে বিশ্বকাপ জেতার পটভূমিকা নিয়েও। ক্রিকেটকে কেন্দ্র করে যে বিশাল বাজার তৈরি হয়েছে, তা ধরে রাখার জন্য বোধহয় এই জয়গুলো আবশ্যক ছিল! মহেন্দ্র সিং ধোনী অধিনায়ক হবার পর থেকেই এরকম কিছু আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে, যুক্তি, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না।

চিরকালই ভারতীয় ব্যাটসম্যানরা বিদেশের গ্রিনটপ উইকেটে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপে। বিজয় মার্চেন্টদের আমল থেকে এই ছবি অব্যাহত। প্রথম দিকে ইংল্যান্ড সফরে সি কে নাইডু, মার্চেন্ট ছাড়া আর কেউ ইংরেজ পেস ব্যাটারিকে বুক চিতিয়ে সামলাতে পারেনি। স্বাধীনতার পর অস্ট্রেলিয়া সফরে একমাত্র বিজয় হাজারেই লিন্ডওয়ান, মিলারকে ঠিকভাবে খেলতে পেরেছিলেন। বিক্ষিপ্তভাবে ভিনু মানকাদ। তারপর পলি উমরিগড়, বিজয় মঞ্জরেকার, পঙ্কজ রায় ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজে চরম ভরাডুবির মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে রান করেছেন। এঁরা ছাড়া বাকি ব্যাটসম্যানরা একপ্রকার পালিয়েই গেছেন। পরবর্তীকালে টাইগার পাতৌদি, চাঁদু বোরদে লড়াই ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন বিপক্ষ শিবিরে। এই চালচিত্রটা খানিকটা বদলায় সুনীল গাভাসকর, গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ বা মহিন্দর অমরনাথদের আমলে।

প্রকৃতপক্ষে গাভাসকরই বিদেশে ফাস্ট বাউন্সি ট্র্যাকে 'জেনুইন' ফাস্ট বোলারদের কিভাবে খেলতে হয় তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, পুরুষাকার ব্যাটসম্যানশিপ অন্যদেরও উদ্দীপ্ত করেছিল। পাশে যোগ্য সঙ্গত করার জন্য ছিলেন বিশ্বনাথ, মহিন্দর, কপিল, ভেঙ্গসরকাররা। সে সময় বিদেশের মাঠে বেশ কয়েকটা দুর্দান্ত টেস্ট ম্যাচ সহ বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত। আর এর পিছনে কোনওরকম অন্য খেলা ছিল না। ১৯৮৩-র বিশ্বকাপে ভয়ঙ্কর সুন্দর ক্যারিবিয়ানদের ফাইনালে যেভাবে বধ করেছিল কপিলবাহিনী, তা আজও ভারতীয় ক্রিকেটে রূপকথা হয়ে আছে। আর আশির দশকে কিসহ বোলিং আক্রমণ ছিল সবদেশে! ক্যারিবিয়ান পেস ব্যাটারির কথা মনে পড়লে আজও মনেপ্রাণে শিহরন আনে। রবার্টস, হোল্ডিং, গার্নার, মার্শাল পেস বোলিং শিল্পকে অন্য উচ্চতায় তুলে নিয়ে গেছেন।

অস্ট্রেলিয়ায় লিলি-টমসন-প্যাসকো-লমন, ইংল্যান্ডে উইলিস, বথাম, ডিলি, পাকিস্তানে ইমরান, আক্রম, সরফরাজ, নিউজিল্যান্ডে রিচার্ড হেডলী। এইসব বোলারকে খেলে গাভাসকর, বিশ্বনাথরা রান করেছেন, ভারতকে টেস্ট ম্যাচ জিতিয়েছেন। পরে হাল ধরেছেন অমরনাথ, ভেঙ্গসরকারেরা। বোলিংয়ে কপিল একা নেতৃত্ব দিয়েছেন, ৩/৪ বছরের জন্য পেয়েছিলেন দিলীপ দোশিকে। দোশির অবসরের পর মহিন্দার সিং ভারতীয় স্পিন বোলিং ঐতিহ্যকে নষ্ট হতে দেননি। আর কপিল মহিন্দারের পর অনিল কুম্বলে এসে হাল ধরেছেন। পাশে ছিলেন জাভাগাল শ্রীনাথ, কপিলের পর সেরা পেসার। এই শক্তি নিয়ে বিদেশে শক্তিশালী দলকে হারিয়েছে ভারত। নতুন শতকে এসে সৌরভ গাঙ্গুলি দলের খোলনলচে বদলাতে ও ক্রিকেটীয় স্পিরিটের মধ্যে থেকে যতটা সম্ভব প্রাধান্য দেখিয়ে টেস্ট সিরিজ জেতা সম্ভব, তা করেছেন।

তারজন্য বোর্ডকর্তাদের সঙ্গে বারে বারে সংঘাতে জড়িয়েছেন। তাঁর নাছোড়বান্দা মনোভাব ও শচীন, দ্রাবিড়ের মতো উঁচু মানের ব্যাটসম্যানদের পাশে পাওয়ায় চিন্তাভাবনা ও যাবতীয় পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছিলেন।

কিন্তু এখন বোঝার সময় এসেছে এই শচীন, দ্রাবিড় বা লক্ষ্মণদের দিয়ে বিদেশে টেস্ট ম্যাচ জেতা সম্ভব নয়। মাঝে কয়েকবছর বিদেশের সব উইকেটে প্রাণ ছিল না। এখন আবার আই সি সি-র নির্দেশে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার উইকেটে ঘাস ছেড়ে রাখা হচ্ছে। তার সঙ্গে বাউন্স ও সুইং মিলে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের চোখে সর্ষে ফুল দেখিয়ে দিচ্ছে। বোঝা উচিত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রিফ্লেক্স, ফুটওয়ার্ক চলে যায়। চোখের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে। ভারতের মরু উইকেটে বল ধরে বুঝে খেলা যায়। স্ট্রোকের জন্য অনেক সময় পাওয়া যায়। ফুটওয়ার্ক, টেকনিক ছাড়াও রান চলে আসে। বিদেশে এসব ত্রুটি নিয়ে সফল হওয়া সম্ভব নয়। শচীন, রাহুল, অসাধারণ ব্যাটসম্যান বলে এখনও চালিয়ে যাচ্ছে, তবে তা দলের কাজে আসছে না। বোর্ডকর্তা ও নির্বাচকদের উচিত তরুণ রক্ত আমদানি করে দলের কাঠামোটাকেই বদলে ফেলা। এই তরুণরা হয়তো সময় নেবে, পরিবেশ, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে নিজেকে মেলে ধরার। আর দরকার ভারতীয় উইকেটের চরিত্র পরিবর্তন। ঘরোয়া ক্রিকেটে যদি বাউন্স পিচে হয়, তাহলে নতুন প্রজন্মের ব্যাটসম্যানরা পেস, সুইং বোলিং খেলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। বিদেশে এরকম চূড়ান্ত অবমাননার মধ্যে পড়তে হবে না।

এবং তাদের সঙ্গে গ্রাম-সমাজের কিছু মাতব্বর জমির মালিক বা জমিদার হয়ে গেল। ফলে উদয়াস্ত পরিশ্রমরত প্রকৃত কৃষকের ওপর শোষণ ও দমন পীড়ন চলতে থাকল। জমিদারির বদলে ইজারাদারি এবং নবাবি আমলের পরিবর্তে কালেক্টারি ব্যবস্থা পরিবর্তনের ফলে রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে গ্রাম্য অর্থনীতির যোগ ছিন্ন হলো। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে কৃষকের ওপর শোষণ-পীড়ন হয়েছে ঠিকই কিন্তু কৃষিজমির পাট্টা বা স্বত্ব ছিল কৃষকের দখলে। কিন্তু ১৭৯৩ সালের পর থেকে ক্রমে প্রকৃত কৃষকদের সিংহভাগই এই স্বত্ব হারাল।

অপরদিকে দেশজ শিল্পের একাধিক শাখায় কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে একদিকে বয়ন শিল্পে ও গ্রাম্য কুটির শিল্পের শিল্পীদের পরিণত করা হলো ভূমিহীন কৃষক ও শ্রমজীবীতে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের আগে প্রায় চারশো বছর ধরে কৃষকের ওপর শোষণ, পীড়ন হয়েছে ঠিকই তবুও কৃষিজমির পাট্টা বা স্বত্ব ছিল কৃষকেরই হাতে। কিন্তু উনিশ শতকের গোড়া থেকে কৃষকদের বেশিরভাগই এই স্বত্ব হারাল। দেখা গেছে ১৮৪২ সালের আগে দেশের কৃষি ও ভূমি ব্যবস্থায় ভূমিহীন কৃষকের কোনও অস্তিত্বই ছিল না। কিন্তু তারপর জমির মালিক কৃষক ও কুটিরশিল্পী এবং গ্রামীণ পেশাজীবী মানুষেরা নিজ নিজ পেশা থেকে উৎখাত হয়ে ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেতমজুরে পরিণত হলো। তাই দেখা যায় ১৯৩১ সালের আদমসুমারিতে সমগ্র বাংলায় কৃষিতে যুক্ত মোট মানুষদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশই ছিল ভূমিহীন কৃষক। পরে ২০01 সালে ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেতমজুরের মোট সংখ্যা হয় প্রায় ১১ কোটি যা ছিল কৃষিতে যুক্ত মোট মানুষের ৪৬ শতাংশ।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর যুগে প্রাক্ স্বাধীনতার পর্বে তিনধরনের ভূমিব্যবস্থার প্রচলন ছিল। (১) **জমিদারি প্রথা**— জমিদার ছিল বিশাল ভূখণ্ডের মালিক, যাদের প্রধান কাজ ছিল কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করা, যার ৯০ শতাংশ ছিল সরকারের প্রাপ্য আর ১০ শতাংশ ছিল জমিদারের প্রাপ্য। কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের ২৫ শতাংশ খাজনা হিসাবে আদায় করত জমিদাররা আর কৃষক পেত ৭৫ শতাংশ। এই প্রথা মূলত বাংলা, বিহার, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশে প্রচলিত ছিল।

(২) **মহালওয়ারি প্রথা**— এই প্রথায় গ্রামের কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের দায়িত্ব থাকত একজন মোড়লের উপর। তিনি কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করে সরকারের কোষাগারে জমা দিয়ে আসতেন। এই প্রথা প্রচলিত ছিল আগ্রা, অযোধ্যা, পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশের কিছু অংশে।

(৩) **রায়ত প্রথা**— এই প্রথায় কৃষক সরাসরি জোতের মালিক ছিল এবং জোতের খাজনা সরাসরি সরকারকে জমা দেওয়ার অধিকারী ছিল। বিক্রি লিজ বা হস্তান্তর করার পূর্ণ অধিকার ছিল রায়তের। এই প্রথা ছিল মহারাষ্ট্রে, উত্তরপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে, মাদ্রাজে (তামিলনাড়ু) প্রভৃতি রাজ্যের কিছু কিছু অংশে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রস্তাব উঠতে লাগল। এবং স্বাধীন ভারতের কেন্দ্র ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের পক্ষে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হলো সেগুলি প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় যথা— (১) মধ্য স্বত্বের বিলোপ (২) প্রজা-স্বত্ব-সংস্কার (৩) জমিজোতের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ।

এই সকল প্রস্তাবের মধ্যে জমি-জোতের ঊর্ধ্বসীমার প্রস্তাব থাকলেও নিম্নসীমার প্রস্তাব ছিল না এবং এখনও নেইও। কারণ কৃষককে জমি-জোতের মাধ্যমে চাষ করে স্বয়ংসম্পূর্ণ-স্বাবলম্বী করার চিন্তা নেতাদের মনে ছিল না। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের থেকেও ভোটের রাজনীতির কথাই তাদের মাথায় বেশি করে খেলেছিল। এবং সব প্রদেশের ভূমি-সংস্কারের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকা উচিত বলেও তাঁরা মনে করেননি। তাই কোনও প্রদেশে জোতের ঊর্ধ্বসীমার একশত একর আবার কোনও প্রদেশে ঊর্ধ্বসীমা ১২.৫ একর। জমির গুণগত মান ও জমি থেকে রোজগারের পরিমাণ বিবেচনা করে সব কটি প্রদেশের আয়ের ভিত্তিতে একটা সমতা রক্ষা করে ঊর্ধ্বসীমা এবং নিম্ন সীমা নির্ধারণ করার চিন্তা ভূমিসংস্কারের নীতির মধ্যে প্রতিফলিত হয়নি। ভারতবর্ষের সবপ্রদেশেই ভূমি সংস্কার আইন পাশ হয়েছে ঠিকই; কিন্তু কোনও কোনও প্রদেশে নামেই ভূমি সংস্কার আইন পাশ হয়েছে কিন্তু আইনের প্রয়োগ হয়নি বা আইন কার্যকরি করার পক্ষে রাজ্য-সরকার তৎপর হয়নি। সংবিধানে ভূমি যেহেতু রাজ্যের পূর্ণ এক্তিয়ারে সেই কারণে এক একটি রাজ্য তার পরিস্থিতি পরিবেশ এবং শাসকদলের নীতি ও আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান ক'রে আর ভোটের রাজনীতির মাপকাঠিতে ভূমি সংস্কার আইন একএকটি রাজ্যে এক একরকম করেছে। ভূমি রাজ্যের এক্তিয়ারে থাকলেও সারা ভারতের সকল কৃষকের সমতা রক্ষার স্বার্থে বা সকল কৃষকের সমান সুযোগ রক্ষার স্বার্থে কেন্দ্র সরকারের একটা নীতি-নির্দেশিকা থাকা উচিত ছিল, যা কেন্দ্র সরকার করেনি। ভূমিসংস্কার শুধু আবেগবশত না করে কৃষকের স্বার্থে, কৃষির স্বার্থে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে ও জমির উৎপাদিকা শক্তি অব্যাহত রাখার স্বার্থে ভূমি সংস্কার আর কৃষি সংস্কার হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে ভূমিসংস্কার হয়েছে রাজনীতির স্বার্থে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গে তিন তিনবার ভূমি সংস্কার আইন পাশ হয়েছে। সংশোধন হয়েছে আরও কয়েক বার। যা ভারতের অন্য কোনও প্রদেশে হয়নি। প্রথম ভূমিসংস্কার আইন পাশ হয় বিধান রায়ের আমলে পাঁচের দশকের গোড়ার দিকে। সেই সংস্কারে বলা হলো জমির সর্বোচ্চ সীমা, একজন কৃষক রাখতে পারবে ৭৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষিজমি। এবং অকৃষি জমির কোনও সীমা নেই। দ্বিতীয় ভূমিসংস্কার হলো ১৯৬৮ সালে যুক্তফ্রন্টের আমলে, যাতে কৃষিজমির সর্বোচ্চ সীমা করা হলো ৩৭.৫ বিঘা অর্থাৎ আগের তুলনায় অর্ধেক এবং অকৃষি জমির সীমা রইল না। তৃতীয় ভূমিসংস্কার করল বামফ্রন্ট সরকার, ১৯৮১ সালে যেটা রাষ্ট্রপতি তিনবার চালাচালি করার পর বাধ্য হয়ে স্বাক্ষর দেন কিছু আপত্তি সহকারে। যার ফলে কিছু কৃষকের হাই কোর্টে আবেদনের ভিত্তিতে, কলিকাতা হাইকোর্ট কিছু কিছু বিষয়ে আপত্তি তোলে যথা অকৃষি জমিকে সিলিং-এর মধ্যে আনা এবং অধিগৃহীত জমির ক্ষতিপূরণের মূল্যের নির্ধারণের উপর। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার হাইকোর্টের রায়ের তোয়াক্কা না করেই চালিয়ে গিয়েছিল তাদের বিজয় রথ।

।। চিত্রকথা ।। শ্রীরামের পূর্বপুরুষ দিলীপ ।। ১০

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

শব্দরূপ-৬১৩ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

১		২		৩			
		৪					
	৫			৬		৭	
৮			৯		১০		
			১১				১২
১৩					১৪		

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. জগৎপালক, **৩.** মাঘ-শুক্লা-পঞ্চমী (সরস্বতী পূজা), **৪.** প্রশংসা, **৫.** ''বাতাসের পায়ে বাজে না আজিকে ঝলমলমল—তার''; বলয়াকার পায়ের গহনা বিশেষ, **৬.** পদাতিক সৈন্য; জাহাজের খালাসী, **৮.** ভগবদ্‌বিষয়ক; বিষ্ণু বা কৃষ্ণের উপাসক, **১০.** কপট; ঔষধাদি মাড়বার পাত্র, **১১.** স্নিগ্ধ দক্ষিণবায়ু, **১৩.** যুদ্ধ করবার ইচ্ছা, **১৪.** নরকভোগ যার কপালে আছে অথবা যে নরক ভোগেরই উপযুক্ত; পাতকী।

উপর-নীচ : ১. স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যের ডাকনাম, **২.** মর্ত্যলোকের নিম্নবর্তী পুরাণোক্ত স্থান, **৩.** বেল, **৫.** মোট, থোক, একত্র, **৭.** কৃতকর্মের ফল যা জন্মান্তরেও ভোগ্য, **৯.** রামায়ণোক্ত নদী বিশেষ, এর তীরে বসেই বাল্মীকি বিশ্বের প্রথম শ্লোকটি উচ্চারণ করেছিলেন, **১০.** খই ভাজায় যে ধানগুলি খই হয়ে ফুটে না, **১২.** সুরা-পরিবেশক।

সমাধান
শব্দরূপ-৬১১
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

ঐ	ন্দ্রি	লা		পূ	র্ণ	ব্র	হ্ম
ক্য		ল	লি	ত			
	বা	সা		না	গ	পা	শ
	ঘ					র্শ্ব	
	ব					না	
না	ন্দী	মু	খ		অ	থ	
			দ্যো	ত	না		শ্রী
ঐ	রা	ব	ত		দি	নে	শ

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৬১৩ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ সংখ্যায়

মালদা জেলায় আর এস এসের পথসঞ্চলন

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর ১১৬তম জন্মদিন উপলক্ষে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মালদা জেলার পক্ষ থেকে ২৩ জানুয়ারি এক পথ সঞ্চলনের ব্যবস্থা করা হয়। ওইদিন দুপুরে মঙ্গলবাড়ি মহানন্দা ব্রিজের কাছ থেকে নেতাজীর ট্যাবলো সহ ২০০-র উপর স্বয়ংসেবক পূর্ণ গণবেশে (সঙ্ঘের ইউনিফর্ম) পথসঞ্চলনের মাধ্যমে মঙ্গলবাড়ি এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

বিবেকানন্দ সেবা সম্মান পাচ্ছেন সুকুমার রায়চৌধুরী

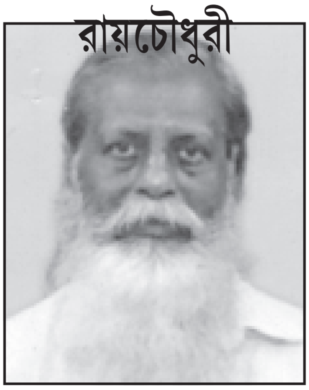

সাহিত্যিক ও সামাজিক সংস্থা বড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের পক্ষ থেকে ২৬তম বিবেকানন্দ সেবাপুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে ১২ ফেব্রুয়ারি। এবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বড়াইল উপজাতি কল্যাণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা নিষ্কাম কর্মযোগী সুকুমার রায়চৌধুরীকে এই সেবা পুরস্কারে সম্মানিত করা হচ্ছে। ১২ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে দশটায় কলকাতার মহাজাতি সদন (অ্যানেক্স) প্রেক্ষাগৃহে এই উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। সুকুমারবাবুর হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ শ্রী বি ভাগাইয়া। পুস্তকালয়ের সম্পাদক মহাবীরপ্রসাদ বাজাজ এক বিজ্ঞপ্তিতে উপরোক্ত সংবাদ জানিয়েছেন। পুরস্কার স্বরূপ মানপত্র, নগদ ৫১ হাজার টাকা প্রদান করা হবে।

কোচবিহারে ভুবনেশ্বর দাসের স্মরণসভা

গত ৬ জানুয়ারি কোচবিহারের প্রাক্তন প্রচারক স্বর্গীয় ভুবনেশ্বর দাসের স্মরণসভা হয়ে গেল। এই সভায় সমসাময়িক স্বয়ংসেবকদের মধ্যে মানসমোহন দত্ত, সমীর গুহ মজুমদার, ডঃ নৃপেন্দ্র চন্দ্র পাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে মানস দত্ত বলেন, ১৯৫১ সালের ১ এপ্রিল ভুবনদা প্রথম সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোচবিহারে প্রচারক হিসাবে আসেন ও তার বাড়িতেই দুপুরে ভোজন করেন। ভুবনেশ্বর দাস তাঁর মিষ্টভাষী আচরণে স্বয়ংসেবককে আকর্ষণ করতে পারতেন। তাঁরই মনোনীত ছিলেন প্রাক্তন কোচবিহার-বিভাগ- সঙ্ঘচালক সুদর্শন চক্রবর্তী (মন্টুদা) এবং জেলা-সঙ্ঘচালক স্বর্গীয়-দুলাল ধর। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত তিনি কোচবিহারে থাকেন এবং এখান থেকেই মেদিনীপুর যান। প্রতিটি পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, সদাহাস্য, ভুবনদা-আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন— কথাগুলি স্মৃতিচারণ করেন সমীর গুহ মজুমদার (বধুদা)। ডঃ নৃপেনচন্দ্র পাল বলেন, ভুবনদার নেতৃত্বেই কোচবিহারে প্রথম শ্রীগুরুজী (আর এস এসের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক) আসেন ও সুষ্ঠুভাবে তিনি এই কার্যক্রম পরিচালনা করেন। আর এস এসের প্রান্ত সেবা প্রমুখ অজিত কুমার পাল, প্রান্ত সম্পর্ক প্রমুখ উদয়শঙ্কর সরকার, কোচবিহার জেলা-প্রচারক অঙ্কুর সাহা প্রমুখ তাঁর স্মৃতিচারণ করে বলেন, ভুবনেশ্বর দাসের জীবনে নিত্যশাখা, সময়ানুবর্তিতা এবং পারিবারিক খোঁজ খবর রাখা, সকল স্বয়ংসেবকদের সঙ্গে সম্পর্ক এবং পত্রের মাধ্যমে সকলের সঙ্গে সম্পর্ক যা ছিল স্বর্গীয় ভুবনদার আদর্শ। তাঁর এই গুণগুলি যদি আমরা নিজের জীবনে পাথেয় করে রাখি তবে এই স্মরণসভা সার্থক হয়ে উঠবে।

তেহট্ট সীমান্তে ধর্মসম্মেলন

গত ৬ জানুয়ারি নদীয়া জেলার তেহট্টের কাছে রাধানগর যশাইতলা প্রাঙ্গণে সীমা জনকল্যাণ সমিতির আহ্বানে এবং হিন্দু জাগরণ মঞ্চের পরিচালনায় এক বিশাল ধর্মসভা হয়ে গেল। প্রধান বক্তা ছিলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বেলডাঙ্গা শাখার সভাপতি প্রদীপ্তানন্দ মহারাজ (কার্তিক মহারাজ)।

মালদা জেলা বইমেলায় সংস্কার ভারতীর অনুষ্ঠান

পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় বৃহত্তম, মালদা জেলার বইমেলাতে এবারই প্রথম সংস্কার ভারতীর সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়ে গেল গত ১৬ জানুয়ারি। প্রয়াত প্রথিতযশা সঙ্গীতশিল্পী ভূপেন হাজারিকার নামাঙ্কিত মঞ্চে সমবেত দেশাত্মবোধ গান ও স্বরচিত গান পরিবেশিত হয় সংস্কার ভারতীর সদস্যদের দ্বারা। গানগুলির রচনা ও তার সুর দিয়েছেন তাপস চক্রবর্তী (সদস্য) ও গজেন দাস (জেলা সংগঠন সভাপতি)। তবলায় সুব্রত সরকার, সিনথেসাইজারে পার্থ দে ও অক্টোপাডে কৌশিক রায় ছিলেন। উল্লেখ্য গত ১০—১৭ জানুয়ারি এই বইমেলাতে প্রতিদিনই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল।

মঙ্গলনিধি

গত ২২ জানুয়ারি উত্তরদিনাজপুর জেলার ইটাহার থানার অন্তর্গত নন্দনগ্রাম শাখার স্বয়ংসেবক স্বপন কুমার সরকারের শুভ বিবাহের প্রীতিভোজে তাঁর বাবা সুনীল কুমার সরকার তাঁর পুত্রবধূর হাত দিয়ে ২০০১ টাকা সীমা জনকল্যাণ সমিতির উত্তরবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক মটুকেশ্বর পালের হাতে অর্পণ করেন।

মালদায় দেশাত্মবোধক গানের ক্যাসেট উন্মোচন

গত ২১ জানুয়ারি মালদা শহরের কলেজ অডিটোরিয়ামে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে 'দেশের আকাশ দেশের বাতাস' নামে দেশাত্মবোধক গানের একটি অডিও ক্যাসেটের উদ্বোধন করা হয়। 'গ্রাফিক্স'-এর প্রচেষ্টায় অহীন্দ্রকুমার দে এবং ডঃ তুষারকান্তি ঘোষের লেখা ও সুর দেওয়া ১০টি দেশাত্মবোধক গানের সঙ্গীত সাজিয়েছেন মান্না দে। এদিনের অডিটোরিয়ামে ভর্তি দর্শকের সামনে জেলার প্রখ্যাত শিল্পীরা তাঁদের গাওয়া গান পরিবেশন করেন, সঙ্গে ছিল নৃত্যানুষ্ঠান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মালদা কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্তোষ চক্রবর্তী, প্রধান অতিথি ডঃ প্রদ্যুৎ ঘোষ, বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী, বিশিষ্ট গায়ক মণিময় মজুমদার ও জগন্নাথ দে এবং আর এস এসের পূর্বক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত। অসুস্থ শরীর নিয়ে এই দেশাত্মবোধক গানের রচয়িতা অহীন্দ্রকুমার দে বলেন, এই গানগুলি ক্যাসেট আকারে বের হবে কোনদিনও ভাবিনি, খুব ভাল লাগছে এবং আমি আরও কিছুদিন বাঁচার প্রেরণা লাভ করলাম। বিভিন্ন বক্তার মুখে তানসেন ও স্বামী বিবেকানন্দের গানের কথা উঠে আসে। ডঃ তুষারকান্তি ঘোষ বলেন, একটা সময়ে আমরা মুখে মুখে এইসব গান রচনা করে গাইতাম এবং অহীন্দ্র কুমার দে-র নিকট গান রচনা করার প্রেরণা পেয়েছিলাম।

'এদেশের মাটি আমার মাথার মণি', 'কোটি শহিদের রক্তে রাঙানো একটি অমর ধাম', 'এদেশ আমার, এদেশ তোমার, এদেশ সবার মা', 'লাঞ্ছিতা মার নির্মম ব্যাথা লাগে যদি তোর প্রাণে' প্রভৃতি গানগুলির ক্যাসেটের দাম ওইদিনের জন্য ৫০ টাকাতে কিনতে দর্শকদের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিদ্যাভারতীর উত্তরবঙ্গের শিশু ক্রীড়া-উৎসব

বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গের প্রাদেশিক শিশু ক্রীড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল মালদা শহরে। গত ২০-২১ জানুয়ারি দু'দিন ব্যাপী এই প্রাদেশিক শিশু ক্রীড়া উৎসবে উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলার ১৪টি সঙ্কুলের (ভাগ) প্রায় ৩০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিল। বিভিন্ন বিভাগের ১৮টি খেলাতে শিশুমন্দিরের শিশুরা অংশগ্রহণ করে নিজেদের প্রতিভা বিকাশের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ২০ জানুয়ারি বিকেলে প্রদেশের বিভিন্ন শিশু মন্দিরের শিশুদের দ্বারা পথ সঞ্চলন মালদা শহর পরিক্রমা করে বৃন্দাবনী মাঠে সমাপ্ত হয়।

মালদহ জেলা স্কুল প্রাঙ্গণ বৃন্দাবনী মাঠে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইংলিশবাজারের বিধায়ক কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। অন্যতম অতিথি হিসেবে ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী পরাশরানন্দ মহারাজ, মালদা পলিটেকনিক কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দীপঙ্কর চক্রবর্তী, মালদা নগরের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ্ তথা প্রাক্তন শিক্ষক মিহির কুমার মিশ্র ও বিদ্যাভারতী পূর্বক্ষেত্রের সভাপতি ক্ষিতীশ চন্দ্র সরকার। প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন বিভাগের সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ করেন প্রাদেশিক শিশু ক্রীড়া উদ্‌যাপন সমিতির সভাপতি গোবিন্দচন্দ্র বসাক, বিদ্যাভারতী উত্তরবঙ্গের সম্পাদক বিশ্বনাথ গড়াই, সুভাষ কুমার দাস, ডঃ রাধাগোবিন্দ ঘোষ, ডঃ তুষার কান্তি ঘোষ, ডাঃ প্রলয় কুমার দাস, মণীন্দ্রচন্দ্র দে প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি।

শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ক্রীড়া পরিচালক সমিতির সম্পাদক সুভাষ কুমার দাস।

সম্মানিত হচ্ছেন রবীন মণ্ডল।

অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্টসের প্রদর্শনী

গত ১৮ ডিসেম্বর অ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্টসের ৭৬তম বার্ষিক সর্বভারতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এর উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী গণেশ হালুই। এই অনুষ্ঠানেই সুপরিচিত শিল্পী রবীন মণ্ডলকে লেডি রাণু মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে সারাজীবনের স্বীকৃতি সম্মান প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মালবিকা সরকার। তিনিই রবীনবাবুর হাতে সম্মান তুলে দেন। চিত্র-প্রদর্শনীতে রবীন মণ্ডলের ছাড়াও প্রকাশ কর্মকার, বিজন চৌধুরী, শুভাপ্রসন্ন, সুনীল দাস, ধীরাজ চৌধুরী, শ্যামশ্রী বসু, নীলিমা দত্ত এবং অন্যান্যদের চিত্রও স্থান পেয়েছিল। ক্যালকাটা পেন্টারস-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রবীণ চিত্রশিল্পী শ্রী মণ্ডল সম্পাদিত 'ড্রইয়িংস বাই ফোর্টিন কনটেম্পরারি আর্টিস্ট অব্ বেঙ্গল' এবং তাঁর লেখা 'আমার কথা' (১৯৯৩) এবং 'শিল্পভাবনা' (২০০৭) বইগুলি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

নজরকাড়া থিমে বাগ্‌দেবীর আরাধনা

এবারেও মেদিনীপুর শহরে সরস্বতী পুজোয় ছিল নজরকাড়া থিম। মানুষের ঢল নেমেছিল থিমের লড়াই দেখার জন্য। তবে প্রচণ্ড শব্দ দূষণের কারণে বিষয়টি-কে কিছু লোক এড়িয়ে গেছেন। অখিল ভারতীর বিদ্যার্থী পরিষদের উদ্যোগে জাগরণ ক্লাব হাল-এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের উপর আক্রমণের থিম এবং সুপিরিয়র ক্লাবের বিবেকানন্দ ছবিসহ নেশার বিরুদ্ধে প্রচার সবার নজর কেড়েছে।

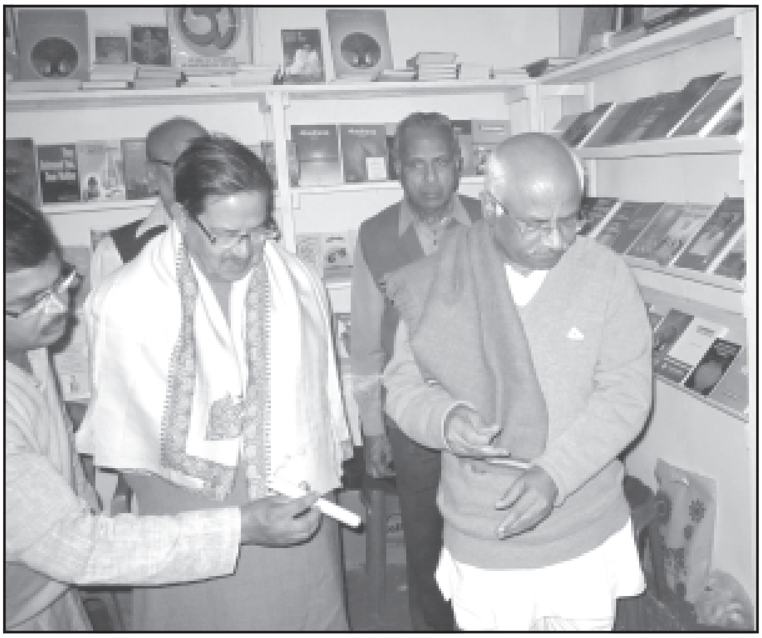

বইমেলায় স্টল পরিদর্শনে (ডানদিক থেকে) সুরেশ সোনি, রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিদ্যুৎ মুখার্জী

বইমেলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বুকস্টল

গত ২৫ জানুয়ারি কলকাতা পুস্তকমেলায় উদ্বোধন হলো বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বুকস্টলের। দীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে স্টলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ সুরেশ সোনী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ব্রহ্মচারী বন্ধুগৌরব মহারাজ, পরিষদের আমেরিকা প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন শ্রীমতি রেণু গুপ্তা, পশ্চিমবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক শচীন্দ্রনাথ সিংহ প্রমুখ। সোনীজী তাঁর বক্তব্যে বলেন যে ভাব প্রকাশের একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম হলো বই। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বইমেলায় পরিষদের বুকস্টলের সাফল্য কামনা করেন। এবার বইমেলায় পরিষদের স্টল নং ১৮৩। এটি প্রায় ২০০ বর্গফুট ক্ষেত্র নিয়ে রয়েছে। হিন্দি, বাংলা ও ইংরাজীতে বহু বই স্টলটিতে রয়েছে। সংস্কৃত ভারতীর বহু বইও এখানে রয়েছে। স্টলটি ঘিরে মানুষের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো।